ইস্‌লাম-দর্পণ।

ত্রিপুরা—পশ্চিমগাঁও নিবাসী

সৈয়দ আবদুল আগফর প্রণীত

কলিকাতা—৪নং কড়েয়া গোরস্থান রোড্ হইতে,
মুন্‌শী আজিজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
৪নং কড়েয়া গোরস্থান রোড্;
রেয়াজুল-ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১০ সাল; আষাঢ়।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার।

ইস্‌লাম প্রচারকের সুযোগ্য সম্পাদক আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব এবং চট্টগ্রাম— সীতাকুণ্ড মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক ও সমাজ-সংস্কারক শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইস্‌লামাবাদী সাহেব আমার এই পুস্তক-খানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; এজন্য উক্ত মহাত্মা দ্বয় সমীপে চির কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

শ্রীসৈয়দ আবদুল আগফর।

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	১৪	অক্ষয়	অক্ষত
৭	১৫	পরস্পর সংযোগে	পরস্পর সংযোগে প্রাকৃতিক নিয়মে
১৫	২৬	বর্ণন	বর্ণন করিতে গেলে
২৪	২৭	ই	ইত
২৬	১	বিস্তারিত	বিস্তারিত বিবরণ
৩৩	১০	শব্দের	শব্দ
৩৫	৮	দেশ	দেশবাসী
৩৬	১৮	বিরাগের	বিরাগ
৩৯	১৩	গুণ ও সকলের মধ্যে	গুণ সকলের মধ্যে
৬৯	১৪	মুসলমান	মুসলমান এই

সূচী-পত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
পৃথিবী অসার	৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও একত্ব	৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের পরিচয় ও গুণ	২৩
মুসলমান ধর্ম্ম	২৪
খৃষ্টিয় ধর্ম্ম	২৬
য়িহুদী ধর্ম্ম	২৮
পারসিক ধর্ম্ম বা অগ্নুপাসক	২৯
হিন্দু ধর্ম্ম	৩০
ব্রাহ্ম ধর্ম্ম	৩১
বৌদ্ধ ধর্ম্ম	৩২
জৈন ধর্ম্ম	৩৬
নানক পন্থী ধর্ম্ম	৩৭
জড়োপাসনা	৩৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মীমাংসা	৩৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কোরাণের সত্যতা	৪৬
পরলোকের অস্তিত্ব	৪৭
মৃত্যুর পর গাত্রোত্থান	৫০
পথ প্রদর্শকের আবশ্যকতা	৫০
পর পর ৪ খানি পবিত্র গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ায় আবশ্যকতা ...	৫০
পৃথিবীর ধ্বংস (কেয়ামত বা মহাপ্রলয়)	৫১

স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব ৫২
শয়তানের অস্তিত্ব ৫২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আরাধনার আবশ্যকতা ৫৪
বৈজ্ঞানিক মতে আরাধনার উপকারিতা ৫৫
নমাজের উপকারিতা ৫৫
পঞ্চ নমাজের পঞ্চ নির্দ্ধারিত সময় ৫৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুদের অপকারিতা ৫৭
খৎনা বা ত্বকচ্ছেদ প্রথার যৌক্তিকতা ৫৮
বিবাহ ৫৮
তালাক (বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ) ৫৯
দায়ভাগ ৬০
বিধবা বিবাহ ৬০
কবর দেওয়া ৬১
অবরোধ-প্রথা ৬১
প্রতিবাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার ৬৩
জাকাৎ (বিশেষ দান) ৬৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মকর্ত্তার চরিত্র ৬৪
পৌত্তলিক হিন্দুদিগের সংস্রবে ভারতীয় মুসলমানদিগের ...
ভয়ানক অনিষ্ট হইয়াছে ৬৪
তরবারি দ্বারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের অপবাদ খণ্ডন ... ৬৬

পরিশিষ্ট।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে পাদরী সি, এন সরকারের মত ৬৮
জমাতে নমাজ পড়া সম্বন্ধে পাদরী সি, এন সরকারের মত ... ৭০
বাইবেল হইতে ইস্‌লামের সত্যতা প্রমাণিত ৭১

বিজ্ঞাপন

ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে পারসী, উর্দ্দু ও বঙ্গভাষায় রাশি রাশি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিধর্ম্মীরা ইস্‌লাম ধর্ম্মান্তর্গত বিধানগুলির অযথা ও অমূলকত্ব প্রতিপন্ন করার মানসে, যাদৃশ কূট তর্কের উদ্ভাবন ও নাস্তিক দলের পরিপুষ্টি করিতেছেন, উহার প্রতিবিধানোপযোগী কোন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। ফলতঃ সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে, উল্লিখিত পুস্তকগুলি ভাষান্তরে অনুবাদিত চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র বৈ নয়। আমি সেই অভাব পরিপূরণ করার মানসে সকল ধর্ম্মের সার সঙ্কলন করিয়া, তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ এই ধর্ম্ম সার সংগ্রহ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লিখিত হয় নাই। কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া, ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রাধান্য, সারবত্তা এবং বিশ্ব-ব্যাপকতা প্রদর্শন করাই এই পুস্তক প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য। কোন ধর্ম্ম বিশেষের উপর আক্রমণ কি উহার নিন্দাবাদ ঘোষণা করা আমার অভিপ্রেত নহে। মাত্র স্বকীয় ধর্ম্মকে বিধর্ম্মীর সূক্ষ্ম বাণ হইতে অবিদ্ধ ও অক্ষয় রাখাই অন্যতর উদ্দেশ্য। এখন সর্ব্বসাধারণ জনগণ সমীপে ইহা সাদরে গৃহীত হইলেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

অনেক দিন হইতে আমার এই পুস্তক খানা প্রণয়ন করার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে যে, আমার প্রাণ সদৃশী প্রিয়তমা বনিতা অকস্মাৎ অকালে পরলোক গমন করাতে, মনে সংযমের সম্পূর্ণ অভাব এবং নিদারুণ মানসিক পীড়া থাকা নিবন্ধন, যথাসময়ে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে পারি নাই। অথচ এখন প্রকাশ করিয়াও ইহাকে আশানুরূপ সুসম্পন্ন করিতে পারিলাম না। অতএব সহৃদয় ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্‌ মহোদয়গণের কৃপার উপর ভারার্পণ করিলাম। যদি তাঁহারা কৃপা পুরঃসর ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া দেন, তবে আমি দ্বিতীয় সংস্করণে পুনরায় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিব এবং তাঁহাদের সমীপে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব।

আমি এই পুস্তকের কোন কোন অংশ মহাত্মা ইমাম গাজ্জালি (রহঃ) কৃত আহ্ইয়া-অল্-অলুম, আওলাদ আলী খোন্দকার কৃত ধর্ম্ম-তত্ত্ব সার, মুন্শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্মদ কৃত এস্লাম-তত্ত্ব, রাজকুমার সেন কৃত Religion book, কালীশঙ্কর দাস কৃত ধর্ম্ম বিজ্ঞান বীজ, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত ধর্ম্ম জিজ্ঞাস্য, মুন্শী মোহাম্মদ মেহের উল্লা কৃত হিন্দু-ধর্ম্ম রহস্য ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত পরকাল নামক উপদেশ গ্রন্থ, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কৃত জীবনাদর্শ এবং নানাবিধ সংবাদ-পত্রাদি হইতে উদ্ধৃত এবং ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়াছি। এজন্য আমি উক্ত গ্রন্থকার ও সম্পাদকদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। অবশিষ্ট সমুদয় অংশ আমার কল্পনা প্রসূত।

শ্রীসৈয়দ আবদুল আগফর।
পশ্চিম গাঁ, পোঃ লাকশাম ; জেলা ত্রিপুরা।

ইস্‌লাম-দর্পণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পৃথিবী অসার।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাইতেছি—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ ইত্যাদি যাবতীয় চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ পদার্থাদি ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং যাহা বিলীন হইতেছে, তাহা পুনরাগত হইতেছে না। আজ যিনি সসাগরা ধরার অধিপতি, আজ যাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে বসুন্ধরা বিকম্পিত, আজ যিনি জয়লব্ধ নানাবিধ ধন রত্ন দ্বারা কোষাগার পূর্ণ করিতেছেন, কাল হয়ত সেই ধন রত্নাদি রাখিয়া তিনিও পরলোক গমন করিবেন। রাজ্যাধিপতি সম্রাট্‌গণ স্বীয় রাজ্য, সিংহাসন, ধন রত্ন, রাজমহিষী, যুবরাজ ও রাজকুমারীগণকে পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন; যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও অচিরে যাইবেন। আজ যে জনক জননী শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া বিবিধ প্রকার স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন, কিছু দিন পরে হয়ত সেই জনক জননীর শিশুকে, কিম্বা শিশুর জনক জননীকে হারাইতে হইবে। আজ যে স্বামী, পরমা সুন্দরী রমণীকে প্রাণেশ্বরী মনে করিয়া জীবন সার্থক মনে করিতেছেন, কিছুদিন পরে সেই প্রিয়তমা হৃদয়হারিণীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আজ যিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইয়া বক্ষঃস্ফীত করতঃ বিদ্বান্ সমাজে বিচরণ করিতেছেন, আজ যিনি অনুপম সৌষ্ঠব সম্পন্ন সুবিস্তৃত গৃহ নিম্মাণ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন, আজ যিনি গৃহ সজ্জার উপযোগী সুন্দর সুন্দর উপকরণে গৃহখানি সুসজ্জিত করিয়া, মনের তৃপ্তি সাধন করিতেছেন, কালে তাহাকে সেই সুখময় গৃহ ও উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত ধামে গমন করিতে হইবে। আজ যিনি

সাংসারিক আবর্জ্জা জালে আবদ্ধ হইয়া 'ভূতের বেগার' খাটিতেছেন, কাল তাঁহাকে সেই চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিতে হইবে। আজ যিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, পরকীয় কঠিন কঠিন রোগ আরোগ্য করিতেছেন, কিছুদিন পরে তাঁহাকে পীড়িত হইয়া জীবনলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি স্বীয় মৃত্যু-রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন না, এবং পূর্ব্বে সূচনা করিয়া ভাবী রোগ নিবারণে সক্ষম হইবেন না। আজ যিনি পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, ধন সম্পত্তিকে আমার আমার বলিতেছেন, তাঁহাকেও সৃজন কর্ত্তার অলঙ্ঘ্য আদেশে বাধ্য হইয়া, চিরদিনের জন্য এই সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ আমাদের জীবন-প্রদীপ যথাসময়ে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। কেহই কাহাকে কি কোন বস্তুকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না—একাকী বিনা সম্বলে শূন্য হস্তে সমাধিস্থ হইতে হইবে। ফলতঃ পৃথিবীর কোন বস্তুই কাহার নহে; এমন কি—দেহ পর্য্যন্তও আমাদের নিজের নহে। সকলই নশ্বর। যে ইংলণ্ডের বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ মন্ত্রী মিঃ গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ও জর্ম্মাণ-মন্ত্রী প্রিন্স বিসমার্ক রাজনৈতিক বিষয় লইয়া রাজ্যবৃদ্ধি কামনায় আজীবন মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও স্বীয় নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। যে সম্রাটেরা পর রাজ্য অধিকার মানসে অহরহ চিন্তাকুল আছেন, কিন্তু কালে তাহার অতি প্রিয়তম দেহরাজ্য যে অতি ক্ষুদ্রতর পিপীলিকা কর্ত্তৃক অধিকৃত ও ভক্ষিত হইবে, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। আমাদের যে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ষষ্ঠী বর্ষাধিক কাল রাজত্ব করিলেন, সেই সাম্রাজ্ঞী এখন কোথায়? এমন স্থলে একটী প্রধান চিন্তার বিষয় এই যে, আমরা কোথায় ছিলাম, কেনই বা এই পৃথিবীতে আসিলাম, আর কেনই বা মরিব; মরণান্তেই বা কি হইবে, আমাদের চিরজীবন লাভের উপায় কি? কি কার্য্য করিলে অনন্ত জীবন লাভ হইবে? পরলোক কি এবং কি কার্য্য করিলে মনুষ্য জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। ফলতঃ পারলৌকিক বিষয় আলোচনা করাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য এবং ইহাই পশু ও মনুষ্যের মধ্যে একমাত্র ব্যবধান। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা যে মরণশীল এবং আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণও মরিয়া গিয়াছেন, এবং বহুতর লোক আমাদের সম্মুখে নিয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহা স্বচক্ষে

প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং মৃত্যুকে ধ্রুব সত্য বলিয়া জানি। তথাপি এমনই যাদু মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া আছি যে, সাংসারিক ক্রিয়া কলাপে জড়িত হইয়া সেই কথা বিস্মৃতি-সলিলে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, দুর্গোৎসবের পাঁঠার ন্যায় * নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দে জীবনাতিবাহিত করিতেছি। হায় হায়! অন্তিম কালের কথা একবারও ভাবি না।

এই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগন্মণ্ডলীর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কোন আদি কর্ত্তা আছেন কি না? দ্বিতীয়তঃ যদি থাকেন, তবে তাঁহার লক্ষণ অর্থাৎ অবস্থানের কৌশল কি? তৃতীয়তঃ তাঁহার উপাসনা অর্থাৎ অভিপ্রেত ক্রিয়া সম্পাদন করা আমাদের কর্ত্তব্য কি না? এবং তাঁহাকে পাইবার সহজ উপায় কি?

* দুর্গোৎসবের সময় বলি দানার্থে উৎসর্গীকৃত পাঁঠাগুলিকে সারি সারি বাঁধিয়া রাখিয়া ক্রমশঃ এক একটী করিয়া বলি দান করে। এক পাঁঠা অন্য পাঁঠার মুণ্ডপাত করিতে দেখে, তথাপি সেই সময় কোন কোন পাঁঠা নিশ্চিন্ত মনে তৃণাদি ভক্ষণ করিতে থাকে। আবার ঐ অবস্থায় কাহারও কাম ভাব উদ্দীপিত হয়। উহারা ভাবী বিপদের বিষয় একটুও চিন্তা করে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও একত্ব।

যেমন কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, তদ্রূপ এক জন নির্ম্মাতা না হইলে কোন বস্তু নির্ম্মিত হইতে পারে না। এরূপ "ঈশ্বর" নামক জনৈক মহাশিল্পী না থাকিলে চন্দ্র, সূর্য্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদাদি যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইতে পারিত না। এই সুবিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সকলই সুশৃঙ্খল ও কৌশলময়। ইহাতে কিছুই নিরর্থক ও অসম্বন্ধ নাই, এক সত্য কাম মঙ্গল সঙ্কল্প মহাপুরুষের ইচ্ছা এ বিশ্বসংসারে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। ইঁনি ঈশ্বর, জ্ঞান এবং মঙ্গল স্বরূপ। আমরা মনুষ্যের আকৃতি তাঁহার জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিষয় মনে না করিয়া, যেমন সুধু মনুষ্যকে ভাবিলে মনুষ্যের ভাব আমাদের মনে আইসে না, সেইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান এবং তাঁহার মঙ্গল ভাব অবগত না হইলে, ঈশ্বর শব্দের অর্থই বোধগম্য হয় না। এই দুই লক্ষণ তাঁহার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র সুব্যক্ত রহিয়াছে। অতএব তিনিই জগতের কারণ, তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয়, সমুদয় বিশ্ব সংসার তাঁহার সুবৃহৎ কৌশল যন্ত্রের অন্তর্গত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য দূরান্তরে যাইবার আবশ্যক নাই। সন্নিকটস্থ স্বকীয় দেহ রাজ্যের প্রতি অবলোকন করুন। দেহের সৃষ্টি-চাতুর্য্য কি আপনা আপনি হইয়াছে? * না কোন বিচক্ষণ শিল্পী দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে?

* প্রাণ হইতে প্রাণ। জড় হইতে প্রাণীর উৎপত্তি হয় না। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর ইহা একটী অমূল্য আবিষ্কার। পূর্ব্বে এক জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জীবাণু সমূহ উষ্ণ জলে নষ্ট করিয়া, সেই জল একটী বোতলে পূরিয়া রাখেন। কতক দিন পরে বোতলটী খুলিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাইলেন, সেই জলে জীবাণু জন্মিয়াছে। তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। কিছুকাল পরে টিণ্ডাল প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ জলকে ভয়ানক রূপে ফুটাইয়া ও চাপ দিয়া জীবাণু নষ্ট করেন এবং সেই জল বোতল পূরিয়া রাখেন, কতক দিন পরে অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিতে পান, জলে একটীও জীবাণু জন্মে নাই।

যদি আপনাকে কেহ প্রশ্ন করে, আপনি কি প্রকারে জাত হইলেন? হয় ত আপনি উত্তর দিবেন যে, আপমি পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ব্ভে জাত হইয়াছেন। কিন্তু একথা স্বীকার করিয়াও যদি আপনাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনার পিতা কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন? আপনি বলিবেন, আপনার পিতামহের ঔরসে ও পিতামহীর গর্ব্ভে জাত হইয়াছেন। ভাল তাহাও যদি স্বীকার করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনার পিতামহ কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন? আপনি ঐ প্রকার উত্তর দিতে থাকিবেন। এরূপ যতই উর্দ্ধে উঠুন না কেন, যতই উত্তর দিতে থাকুন না কেন, পরিশেষে আপনার এমন এক স্থানে অবশ্য ঠেকিতে হইবে এবং সর্ব্বশেষে এরূপ এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবেন যে, যাঁহার পিতার পিতা নাই। এমত স্থলে যদি আপনাকে প্রশ্ন করা যায়, পিতার পিতা নাই তাহার উৎপত্তি কি ভাবে হইল? আপনি বোধ হয় ইহার কোন সন্তোষ জনক উত্তর দিতে পারিবেন না। কারণ, পিতা পুত্র রূপে গণ্য হইয়া আর উর্দ্ধে উঠিতে পারিলেন না। এরূপ যদি ভিন্ন ভাবে উত্তর করেন, যে পিতার পিতা নাই, তিনি পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগে আপনা আপনি জন্ম লাভ করিয়াছেন। এই কথার প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করি, সেই প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্তা কে এবং মূলীভূত পদার্থ নিচয়ের নির্ম্মাতা এবং শক্তিদাতা কোন্ ব্যক্তি? হয় ত আপনি আবারও উত্তর দিতে অসক্ত হইবেন। যদি না হন এবং বলেন, শক্তিই সমুদয় পদার্থের মূলাধার, শক্তি হইতে সমুদয় বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে (বৌদ্ধ মতানুযায়ী)। তবে ঈদৃশ উত্তর কথনও যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত কথা যে, শক্তি কোন বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত বিকাশ হইতে পারে না; সুতরাং শক্তির জন্য পদার্থের প্রয়োজন। তবে সেই শক্তিই যদি ঈশ্বর হন, তাহা হইলে পদার্থ কি? এবং কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি? শক্তি হইতে ত কোন পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। তবে সকল পদার্থেরই শক্তি আছে, একথা স্বীকার করি; কিন্তু

তখন তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জড় হইতে জীবাণু উৎপত্তি হয় না। আমরা আশা করি, উনবিংশ শতাব্দী এই যে একটী অমূল্য সত্য মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা যেন কেহ ভুলিয়া না যান। বিজ্ঞানের এই নব আবিষ্কারে ধর্ম্মজগতের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে।

পরমাণু যাহা সমস্ত পদার্থের মূল, শক্তি ভিন্ন তাহার যে এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা আছে, তাহাও ত স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। অতএব শক্তি এবং পরমাণু এতদুভয়ের যে এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কেন না তাহারা এক বস্তু নহে, প্রত্যেকের ধর্ম্ম ও ক্রিয়া স্বতন্ত্র। দুইটী স্বতন্ত্র বস্তুর সংযোগে যখন অন্যান্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহাদের সৃজনকর্ত্তা ও বিধাতা এক জন না হইয়াই থাকিতে পারেন না, সেই ব্যক্তি যে কে, তাহা অচিন্ত্যনীয়; কিন্তু তিনি আছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগের প্রথম পরিচ্ছেদের লিখিত প্রথম বিচার্য্য বিষয়ের এক প্রকার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। পরমেশ্বর আছেন, একথা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। এক্ষণে আসুন আমাদিগের বিচার্য্য দ্বিতীয় বিষয়ের আন্দোলন করা যাউক। পরমেশ্বরের লক্ষণ কি? অর্থাৎ তিনি কি অবস্থায় কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, এ বিষয়ের কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারি কি না? পূর্ব্ব মীমাংসান্তেই এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, ঈশ্বর সকল বস্তুতেই আছেন। যেহেতু বস্তুমাত্রেরই শক্তি আছে এবং শক্তিতেই ঈশ্বর আছেন। আর বস্তু মাত্রেই পরমাণু আছে এবং পরমাণুতেও ঈশ্বর আছেন। কেন না, শক্তি ও পরমাণুর যখন ক্রিয়া আছে, তখন তাহাদের সাধনকারী কর্ত্তাও আছে। কর্ত্তা না থাকিলে ত ক্রিয়া হইতেই পারে না। নিজে না গেলে যাইতেছে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় কিসে? নিজে না করিলে, করিতেছি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় কিসে? যখন কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তখন কর্ত্তা তাহার সঙ্গে থাকিবেই থাকিবে। অতএব পরমাণু এবং শক্তি যখন কোন ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে, তখন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তাও থাকে। এখন দেখা যায় যে, এমন মুহূর্ত্ত নাই, যখন প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তি আপনাপন কোন না কোন এক ক্রিয়ায় লিপ্ত না আছে। অতএব পরমাণু ও শক্তি যখন যে স্থানে যে ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে, তখন ঈশ্বরও অদৃশ্য ভাবে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। এইরূপ অসীম ব্রহ্মাণ্ড যখন কেবল কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি এবং শক্তি যখন তাহার প্রত্যেক পরমাণুর চির সহচর, তখন ঈশ্বর যে তাহাদের সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অদৃশ্য ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাতে সন্দেহ কি? এক্ষণে দেখা চাই যে, সেই ঈশ্বর এক কি তাঁহার সমশ্রেণীর আর কেহ আছেন।

যদি ঈশ্বরের সম শ্রেণীর অন্য কেহ থাকে, তবে তাঁহাকে সৃষ্টি করিল কে? এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে। সমস্তের সৃষ্টিকর্ত্তাকে যখন ঈশ্বর বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে, তখন ইহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা থাকিলে ইহারা কেহই পরমেশ্বরের বাচ্য হইতে পারেন না; এক ঈশ্বর দুই জন হইলে প্রত্যেক কার্য্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইত। অতএব যিনি পরমেশ্বর তিনি কখনও দুই হইতে পারেন না এবং কেহ তাঁহার পিতা (জন্মদাতা) হইতে পারেন না। আবার পূর্ব্ব মীমাংসায় দেখা গিয়াছে যে, তিনি কাহারও পিতা হইতে পারেন না। কেন না যে পিতার পিতা নাই, তাহারই সৃষ্টকর্ত্তা পরমেশ্বর। অতএব আমাদের এই মীমাংসায় নির্দ্ধারিত হইল যে, পরমেশ্বর অদ্বিতীয় নিরাকার। ন মাতা, ন পিতা, ন বন্ধু, ন বান্ধব এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজিত। জগতের এমন স্থান নাই, যে স্থানে তিনি অদৃশ্য ভাবে না আছেন, এবং এমন ক্রিয়া নাই, যাহার তিনি কর্ত্তা নহেন।।

বাস্তবিক সহজ জ্ঞানে ও সরল বিশ্বাসে ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিলে মনে যেমন সহজেই তাঁহার অস্তিত্বের অনুভব ও ধারণা হয়, যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রমাণ প্রয়োগ তদ্রূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। বলিতে কি, বিবেকের আশ্রয় লইলে, ঈশ্বর বিশ্বাস যেন আপনা হইতেই আসে।

যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সে নাস্তিক। নাস্তিকদিগের মত যে কতদূর মূল্যবান্ তাহা এই সামান্য যুক্তি দ্বারা বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইবে; যথা—শূন্য অর্থাৎ কিছুই নয়; আমরা সমস্ত পদার্থের মূলে একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি। কিন্তু নাস্তিকগণ বলেন, আদৌ ঈশ্বর নাই, অর্থাৎ শূন্য। প্রিয় পাঠক একবার স্থির চিত্তে বিচার করিয়া দেখুন যে, কোন একটী নির্ণয়াত্মক রাশি স্থাপন করিয়া উহার দক্ষিণ ক্রমান্বয়ে শূন্য যোগ করিলে দেখা যায় যে, শেষ শূন্যটী দ্বারা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাশিটী দশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যথা ১০০০০০ এই প্রকার শূন্য যোগ করিলে, ক্রমান্বয়েই ঐরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ঐ সকল শূন্য রাশির প্রথমে কোন নির্ণয়াত্মক রাশি না থাকিলে ঐ শূন্যগুলি কিছুই নহে; উহা কেবল শূন্য শূন্যং মাত্র। অতএব নাস্তিকদিগের মত ঐরূপ মূল্য শূন্য। এক্ষণে এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি মূলে এক নির্দ্দিষ্ট সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর। মানবগণ দর্শন ও কল্পনা বলে এ যাবৎ যত প্রকার শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে যে শক্তি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহার আধারই ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছে।

এক রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের অগ্রে কে আছে? মন্ত্রী উত্তর দিলেন, এক সংখ্যার অগ্রে যদি কিছু আকার সম্ভব হয়, তবে ঈশ্বরের অগ্রেও কিছু থাকিতে পারে। সুতরাং একের অগ্রেও কিছু নাই, ঈশ্বরের অগ্রেও কিছু নাই। বস্তুত ঐশ্বরিক বিষয়ে আমরা সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধীন। এজন্য আমরা ঐশী সীমার বাহিরে অর্থাৎ ঈশ্বরের ঊর্দ্ধে গমন করিতে পারি না। মূল কথা এই, ঈশ্বর আমাদিগকে তদুপযোগী জ্ঞান দেন নাই, দিলে তাঁহার গৌরব থাকিত না। আর কেহ সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে চাহিলে, তিনি কস্মিন্ কালেও তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন না। লাভের মধ্যে তিনি নাস্তিক হইবেন সন্দেহ নাই। যদি কোন প্রকৃতিবাদী কি নাস্তিক বলেন যে, ঈশ্বর নাই, প্রকৃতির শক্তি বলে চন্দ্র, সূর্য্য, মনুষ্য ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার উত্তরে বলি, প্রকৃতি অচেতন, অন্ধ এবং জ্ঞানহীন মৃত্তিকা বৈ নয়। সেই অচেতন বস্তু কখনই চৈতন্যময় বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না এবং চৈতন্যময় বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত প্রকৃতির শক্তি প্রকাশ হইতে পারে না। প্রকৃতি ছাঁচ স্বরূপ, ছাঁচের গঠন ব্যতীত ভিন্নাকার বস্তু ছাঁচে নির্ম্মিত হইতে পারে না। আর নির্ম্মিত হইলেও একাকার বস্তু নির্ম্মিত হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রযুক্ত নানা-বিধ আকারের প্রাণী ও উদ্ভিদাদি অহরহ নির্ম্মিত হইতেছে। নির্ম্মাতা ব্যতীত কেবল স্ত্রী পুরুষের সঙ্গম যদি সন্তান হইত; তবে মাংসের একটী পিণ্ডবৎ বস্তু গর্ভে জন্মিত; আকার বিশিষ্ট কখনই জন্মিত না। আর আকার বিশিষ্ট জন্মিলেও অস্বাভাবিক আকারের অর্থাৎ কোন সময় কাহার তিন হাত, কেহ অন্ধ, কাহারও হাত পা বিহীন ও এক গর্ভে চারিটী সন্তান জন্মিত না। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকিত, তবে এইরূপ * সুশৃঙ্খলার

* ফলের বীজে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি প্রকাশ পায়। যাহাতে প্রত্যেক জাতীয় বৃক্ষ নষ্ট হইয়া গেলে জগতে সেই জাতীয় বৃক্ষের অভাব না হয়, যাহাতে ভাবী বংশীয় জীবগণ সেই জাতীয় বৃক্ষের ফল ভোজনে বঞ্চিত না হয়, তজ্জন্য ফলের ভিতরে বীজ রহিয়াছে। ঐ বীজে এমন শক্তি নিহিত রহিয়াছে যে, উহা হইতে আশ্চর্য্য প্রণালীতে নূতন বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইতেছে। প্রকৃতির অন্তর্গত শক্তি কেবল যে বর্ত্তমান বংশীয় জীবগণকে ফল শস্য দান করিতেছে, এমন নহে; ভাবী বংশীয়দিগের জন্যও আয়োজন করিতেছে।

সহিত দিবা রাত্রি হইত না, নিয়ম মত সূর্য্য কিরণ দিত না, সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইত না; মেঘ হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া ক্ষেত্র উর্ব্বরশালী হইত না;

ইহাতে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ভাবী জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে। প্রাকৃতিক শক্তি জ্ঞানময়ী—অন্ধ শক্তি নহে।

সন্দেহবাদী বলিবেন, জড় পরমাণুর সংযোগে বিয়োগে জগৎ সংগঠিত হইয়াছে বলিলেই হয়। এক জন জ্ঞান সম্পন্ন স্রষ্টা আছেন, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। এই পরমাশ্চর্য্য কৌশলপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড কি অন্ধ জড় পরমাণু বা জড় শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে? কৌশলে জ্ঞান প্রকাশ পায়, বুদ্ধিশূন্য চেতনা বিহীন জড় পরমাণু কি এই দূর গ্রাহ্য কৌশল পরম্পরা সৃষ্টি করিতে পারে? এই যে মানব দেহ আমরা ধারণ করিতেছি, ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্য ব্যাপার!! বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া অথবা সহজ বুদ্ধিতে যেরূপেই হউক আলোচনা কর, মানব দেহের প্রত্যেক অঙ্গ তোমার নিকট তাহার স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবে। প্রসিদ্ধ ডাক্তার বেলী বলিয়াছেন, আমি মানব দেহ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, আমাদের জীবন এক অলৌকিক ব্যাপার।

ধাত্রী বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে যে সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার অবগত হওয়া যায়, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই; কেবল প্রসব সম্বন্ধীয় একটী যুক্তি বলিব। মনে কর, একটী জঙ্গলময় সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া তোমাকে গমন করিতে হইবে। এরূপ স্থলে পথের অবস্থা যেখানে যেমন তোমার শরীরকেও সেখানে সেই ভাবে রক্ষা করা আবশ্যক। মনে কর, এক স্থানে একটা বৃক্ষের শাখা নিম্নের দিকে নত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে তুমি কখনই মস্তক উচ্চ করিয়া গমন করিতে পার না; অবনত মস্তকে যাইতে হইবে। মনে কর, আর এক স্থানে দুই দিক হইতে বৃক্ষ শাখা সকল পতিত হইয়া, পথ এরূপ সঙ্কীর্ণ করিয়াছে যে, সোজা চলিতে হইলে তোমার দুই স্কন্ধ বাঁধিবে। সেখানে তুমি কি করিবে? তোমার মুখ ও সমস্ত শরীর ফিরাইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া গমন করিতে হইবে।

মাতৃগর্ভ হইতে প্রসব কালে অবিকল তাহাই ঘটে। প্রসব পথের যে স্থান যেরূপে সংগঠিত, মাতৃগর্ভস্থ অদৃশ্য শক্তি দ্বারা শিশু শরীর সেখানে সেই ভাবে সংস্থিত হয়। নতুবা প্রসব কার্য্য অসম্ভব হইত। প্রসব পথে স্থান বিশেষে যখনই শিশুর স্কন্ধদ্বয় আটকাইয়া যায়, তখন গর্ভস্থ শক্তি দ্বারা উহার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন হয় এবং শিশু সহজে গম্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, মাতৃগর্ভস্থ শক্তি যদি অন্ধ শক্তি হয়, তাহা হইলে উহা কেমন করিয়া জানিল যে শিশুর পক্ষে প্রসূত হওয়া

বরং সমুদয় কার্য্যে বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইত। ফলতঃ যখন যাহা আমাদের আবশ্যকীয় ও হিতকর, তাহা * সংগৃহীত হইত না। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি কৌশলময় হইত না, বিশ্রামের জন্য রাত্রি কাল ও পরিশ্রম করিবার জন্য দিবাভাগ নির্দ্দিষ্ট হইত না, স্বভাবের শোভা বিলোকন করার জন্য প্রাতঃকাল, চন্দ্রমা নিশি, তারকারাজি সমুদিত সুবিস্তীর্ণ আকাশ মণ্ডল দৃষ্ট হইত না। ঈশ্বর আমাদের চিত্তরঞ্জন করার জন্য বিশাল সমুদ্রোপরি সূর্য্যোদয়

আবশ্যক? উহা কেমন করিয়া জানিতে পারে যে, ঐসব পথের স্থান বিশেষে শিশুর শরীর আটকাইয়া যায়? কেমন করিয়া বা জানিতে পারে যে, শিশুর শরীরকে বিশেষ ভাবে সংস্থাপন করিলে উহা সহজে নির্গত হইতে পারে? ইহা কি অচৈতন্য অন্ধ শক্তির কার্য্য?

মহাত্মা কার্লাইল বলিয়াছেন, যাহারা তর্ক করিয়া পরমেশ্বরের স্বত্তা প্রতিপন্ন করিতে যায়, তাহারা সূর্য্য দেখিবার জন্য লণ্ঠন জ্বালে।

ভগবান্ মানবাত্মার মধ্যে তাহার আদেশ প্রকাশ করেন, ইহা কি আপনারা বিশ্বাস করেন? আমি মনে করি, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়ে যেমন তিনি আমাদিগকে আদেশ করেন, তেমনি শারীরিক বিষয়েও তিনি এক প্রকার আদেশ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত সময় আহার পান করিবার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহার এক প্রকার আদেশ। আমাদের কল্যাণের জন্য প্রতিদিন তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে, আহার পানের উপযুক্ত সময় হইয়াছে।

* বজ্রাঘাতের মধ্যেও পরমেশ্বরের শুভাভিপ্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ঝটিকা, বজ্রাঘাত ও বিদ্যুতে বায়ুকে বিশুদ্ধ করে। যে বিষ জীবের প্রাণ সংহারক, তাহাই বিকারগ্রস্ত রোগীর পক্ষে অমৃত হইয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করে। যখন কোন জীব হিংস্র জন্তুর মুখে পতিত হয়, তখন উহা মেসমেরাইজড' হইয়া যায়। এক প্রকার হিংস্র সর্প আছে, তাহা কোন বৃক্ষ তলে থাকিয়া বিশেষ কোন শব্দ করিলে বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট পক্ষী আপনা আপনি আকৃষ্ট হইয়া উক্ত সর্পের মুখে পতিত হয়। তখন সর্প উহাকে ভক্ষণ করে। সর্পের দৃশ্য শক্তিতে পক্ষী "মেসমেরাইজড্" হইয়া যায়। কোন জন্তু "মেসমেরাইজড্" হইলে তাহার আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না; কোন প্রকার যন্ত্রণা বোধ থাকে না। মিঃ গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন, লোকে যখন আমার কথা বুঝে না, তখন ঈশ্বরের বিষয় কি বুঝিবে? আমি কি অভিপ্রায়ে কি কার্য্য করি, ইংলণ্ডবাসিগণ কি তাহা বুঝিতে পারে? আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নানা কথা বলে।

ও সূর্য্য অস্ত কাল, গম্ভীর সমুদ্র লহরী ও কল্লোল, সমুদ্রের প্রশান্ত মূর্ত্তি সৃজন করিয়াছেন। দিক্‌দর্শন এবং রাত্রির পরিমাণ স্থির করার জন্য নক্ষত্র মালা সৃজন করিয়াছেন। প্রকৃতির বিচিত্র শোভা প্রদর্শন করার জন্য বিজন গহন পর্ব্বত সৃজন করিয়াছেন। ঈশ্বর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানব জাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, চক্ষু, মস্তিষ্ক ও গঠন প্রণালী নির্ম্মাতার অসীম নৈপুণ্যের পরিচায়ক। হাত, চক্ষু, দন্ত, কর্ণ, নাসিকা যাহা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ও সুবিধা জনক, ঈশ্বর আমাদিগকে তাহাই দিয়াছেন। আমরা যখন জননীর গর্ভে বাস করিতেছিলাম, তখন তাহার প্রথমাবস্থায় আমাদিগের এ সকল সম্পদ কিছুই ছিল না। এই পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে এক জন জ্ঞানবান্ হইতে আমরা এই সকল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং এই সকল সম্পদ লইয়া এই অজ্ঞাত পৃথিবীতে আসিয়াছি। পৃথিবীতে আসিলে আমাদের এ সকল সম্পত্তির প্রয়োজন হইবে, উহা বিবেচনা করিবার কেহ না থাকিলে কি প্রকারে আমরা এই সকল লাভ করিলাম। বিবেচনা ব্যতীত উপযুক্ত বস্তু পাওয়া যায় না। কিন্তু বিবেচনা কাহার? বিবেচনা কখনই শূন্য হইতে আসিতে পারে না; তাহার পাত্র থাকা আবশ্যক। পাত্রই ভাবার্থে ঈশ্বর। যেমন রেলওয়ে এবং ষ্টিমার পরিচালিত হইবার জন্য ইঞ্জিন আছে, সেইরূপ আমাদের পাকস্থলী ইত্যাদি ঠিক ইঞ্জিনের ন্যায় নির্ম্মিত হইয়াছে। হংসের পায়ের পাতাগুলি সাঁতার দিবার উপযোগী করিয়া সৃজন করিয়াছেন; ব্যাঘ্র, বিড়াল ও কুকুরের দন্তগুলি মাংস খাওয়ার উপযোগী করিয়াছেন; সাঁতার দিবার জন্য মৎস্যের দুই খানা পাখা দিয়াছেন; মূষিক ধরিবার জন্য বিড়ালের দৃষ্টি শক্তি অধিক দিয়াছেন; মরুভূমিতে যাতায়াত করার জন্য উষ্ট্রকে কষ্টসহিষ্ণু ও তাহাদের পা গুলি সেই উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে যাতায়াতের উপযুক্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই রূপ যে দেশের লোক ও পশু পক্ষীর যাহা খাদ্যোপযোগী ও প্রয়োজনীয়, সেই দেশে সেই বস্তু প্রচুর পরিমাণে জন্ম দিয়াছেন। অনেক সময়ে আবার প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে বিচিত্র অলৌকিক কার্য্যগুলি দেখাইয়াছেন; কয়লার ভিতরে হীরকের জন্ম দিয়াছেন; ঝিনুকের মধ্যে মুক্তার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন; বৃক্ষোপরি নারিকেলের মধ্যে জলের সৃষ্টি করিয়াছেন; বাদুর পক্ষী (অন্যান্য পক্ষীর বিপরীত) মুখের দ্বারা মলপরিত্যাগ করে; ময়ূর অস্বাভাবিক

উপায়ে সন্তানোৎপাদন করে ; ময়ূর নৃত্য করিতে করিতে মুখ হইতে জলবং তরল বস্তু নির্গত হয়, ময়ূরী তৎক্ষণাৎ তাহা ভক্ষণ করে, তাহাতেই ডিম্ব উৎপন্ন হয়। কিন্তু ময়ূর ময়ূরী পরস্পর সঙ্গম করে না। আবার কোকিল কখনও বাসা নির্ম্মাণ করে না, কাকের বাসায় ডিম্ব প্রসব করে। কাক অপরিচিত ভাবে সেই ডিম্বে তা দেয়, তাহাতেই ডিম্ব ফুটে এবং কোকিল-শাবক নির্গত হয়।

দেখ, ঈশ্বর মানব জাতিকে কিরূপ কৌশলময় প্রণালীতে সৃজন করিয়াছেন। যখন ঈশ্বর মানব প্রাণীর জন্ম দিবার মানস করেন, তখন দম্পাত প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া পরস্পরের সঙ্গমে অপবিত্র জল নিঃসৃত হয়। সেই অপবিত্র জল বিন্দু স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হয়, সেই জল বিন্দু হইতে সন্তান ক্রমশঃ মনুষ্যাকারে নির্ম্মিত হইতে থাকে। সন্তান ৯ মাস ৯ দিন গর্ব্ভাবস্থায় অবস্থিতি করে। বিধাতা গর্ব্ভ মধ্যে অদৃশ্য ভাবে চক্ষু, মুখ, কর্ণ নাসিকা, হাত, পা বিশিষ্ট একটী মানব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রাণ দান করেন এবং তাহার আহার যোগান, জরায়ু মধ্যে সন্তানকে জলোপরি ভাসমান রাখেন এবং শিশুর নাভিমূলে সংযুক্ত দুইটী রক্ত বাহিনী শিরা দ্বারা রক্ত যোগাইয়া শিশুকে জীবিত রাখিয়া থাকেন। তদনন্তর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ সন্তান নিতান্ত কোমল এবং পরিপাক শক্তি বিরহিত। এজন্য জাত হইবার ৫ মাস পূর্ব্বেই তিনি মাতৃ স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করিয়াছেন। মাতৃ-স্তন অতি কোমল এবং বহু সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট। যদি ছিদ্র বড় হইত, তবে এক সঙ্গে বেশী পরিমাণ দুগ্ধ শিশুর উদরস্থ হইয়া অপকার করিত। সুতরাং মৃদু ভাবে দুগ্ধ যোগাইবার জন্য স্তনাগ্র সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট করিয়াছেন। যখন ২ বৎসর সময় অতিবাহিত হয়, এবং দুগ্ধ পানের অনাবশ্যকতা অনুভব করেন, তখন তাহার মুখ গহ্বরে কোমল দন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। শিশুরা আশ্রয় ব্যতীত আহার নিদ্রা করিতে পারে না, এজন্য পিতা মাতার অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার করিয়া দিলেন। অতঃপর শিশু ক্রমশঃ বাড়িয়া কার্য্যক্ষম হইবার উপক্রম হইল। ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার দয়ার হ্রাস হইতে লাগিল এবং শিশুর পঞ্চেন্দ্রিয়ও সতেজ হইতে লাগিল। দেখিতে চক্ষু দিলেন, শুনিতে কর্ণ দিলেন, নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ এবং আঘ্রাণ লইতে নাসিকা দিলেন। নাসিকা রন্ধ্রগুলি লোমে পরিপূর্ণ। যদি নাসিকা রন্ধ্রে

(বিবরে) লোম না হইত, তবে কে বায়ু বিশোধিত করিয়া লইয়া যাইত? বরং বায়ু প্রশ্বাসে ধূলা প্রভৃতি অনিষ্টকারী বস্তু অভ্যন্তরে নীত হইয়া প্রাণ বিনাশ করিত। তিনি বাক্য উচ্চারণের জন্য রসনা দিয়াছেন, মস্তকের শোভা বদ্ধনের জন্য চুল দিয়াছেন; বায়ু প্রবিষ্ট হইবার জন্য কর্ণে ছিদ্র দিয়াছেন। কীটাদি প্রবিষ্ট না হইতে পারে এবং প্রবিষ্ট হইবামাত্র টের পাওয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে কর্ণের রন্ধ্র বক্র করিয়া নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। মুখের শোভা সম্পাদন এবং খাদ্য দ্রব্য চিবাইবার জন্য দন্তাবলী প্রদান করিয়াছেন। কোন দন্ত সূক্ষ্মাগ্র বিশিষ্ট, কোন দন্ত জাঁতার ন্যায়। সূক্ষ্মাগ্র দন্ত দ্বারা মাংসাদি কর্ত্তন করা যায় এবং জাঁতার দ্বারা পেষণ ও চূর্ণ করার কার্য্য সাধিত হয়। শরীর চুলকাইবার জন্য নখ দিয়াছেন, আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য পঞ্চাঙ্গুলী দিয়াছেন। দূরের বস্তু ধরিবার জন্য এবং স্পর্শ করিবার জন্য হস্ত দিয়াছেন; খাদ্য দ্রব্য সঞ্চিত করার জন্য পেট দিয়াছেন; পরিপাক করার জন্য পিত্তাগ্নি প্রদান করিয়াছেন। চলিবার জন্য পা দিয়াছেন, পরিচয় করার জন্য প্রত্যেক মনুষ্যের স্বর এবং আকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদান করিয়াছেন। চক্ষু না থাকিলে আমাদের সম্বন্ধে বাহ্য জগৎ থাকা না থাকা সমান হইত। আবার বাহ্য জগতের নানাপ্রকার ঘটনাতে সেই সুন্দর কোমল চক্ষু বিনষ্ট হইতে না পারে, এজন্য অতি সুন্দর কৌশলময় দুইটী কপাটে তাহা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। আবার চক্ষু ২টী যে দিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, একটী নষ্ট হইলে অপরটী দ্বারা কাজ চলিতে পারে। চক্ষুর কপাট এমন সুন্দর কৌশলে ব্যবস্থাপিত যে বিপদ উপস্থিত হইলে আপনা হইতে চক্ষুকে রক্ষা করে; কর্ত্তার কিছু চেষ্টার প্রয়োজন করে না। আবার সেই পার্শ্বস্থ কপাট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃষ্ণ লোমরাজিতে সজ্জিত রহিয়াছে। তাহা দ্বারা বাহিরের আলোক উত্তাপ কীট বালুকাদি হইতে চক্ষু রক্ষিত হইতেছে। দয়াময় জগৎপাতা এইরূপে প্রত্যেক বস্তুই আমাদের আবশ্যকীয় করিয়া সৃজন করিয়াছেন।

ফলতঃ ঈশ্বর কর্ত্তৃক একটী ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা বর্ণন ন্যূনকল্পে একখানা বৃহদায়তন Welester ডিক্‌সনারি হইয়া পড়ে। পশু পক্ষীকে ইনষ্টিংট (Instinet) বুদ্ধি অর্থাৎ সীমা বিশিষ্ট স্বভাব জাত বুদ্ধি প্রদান করিয়া-

ছেন। যেমন মাংস খাওয়া, বাচ্ছা দেওয়া এবং সময়ানুসারে গর্ত্ত রক্ষা করা ইত্যাদি। কিন্তু মানব জাতিকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পার্থিব কার্য্যের যথেচ্ছা উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু পশুগণ তাহা পারে না। যদি পশুদিগের সীমা বিশিষ্ট বুদ্ধি না থাকিত, তবে কখনও তাহারা মনুষ্যের আনুগত্য স্বীকার করিত না। মনুষ্যের সন্তান প্রসব করিতে যত কষ্ট হয়, পশুর তদ্রূপ হয় না; কারণ তাহা হইলে পশুর শুশ্রূষা-কারী পাওয়া যাইত না। বুদ্ধি বিহীন পশুদিগের ঘন ঘন রোগ হইলে চিকিৎসা করা কঠিন হইত। শস্যাদি নাশক কীটাদির বিনাশ জন্য বক, গনাকোটী প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীর সৃষ্টি করিয়াছেন। গবাদি পশুর গাত্রস্থ পোকা ধ্বংস করার জন্য কাক এবং শালিক পক্ষীর সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাই প্রকৃতিবাদী, বল দেখি, ভূত ভবিষ্যৎ দৃষ্ট করিয়া সৃষ্টি করা কি অচেতন প্রকৃতির কার্য্য? মাকড়সা, মৌমাছি এবং ভিমরুল, কুমারিকা কিরূপ নিপুণতার সহিত জাল ও চক্র নির্ম্মাণ করে। বাবুইর বাসা নির্ম্মাণ কার্য্য দেখিলে আরও অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। লাউ এবং সিম গাছের প্রকৃতি দৃষ্ট করিলে ঈশ্বরের অপার মহিমার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। লতার ছোট ছোট আকড়া রেখাগুলি বিনা সাহায্যে আপনা আপনি বাঁশে জড়াইয়া ধরে। ফুল বাগানে গোলাপ, জুঁই, চামেলী, মালতী, বেলী প্রভৃতি নব প্রস্ফুটিত ফুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এবং তাহাদের আঘ্রাণ লইলে কোন্ সহৃদয় ব্যাক্তির অন্তঃকরণ ভক্তি রসে আপ্লুত না হয়? আহা! শুক্ল পক্ষ নিশিতে সরোবরে জলোপরি কুমুদিনী প্রভৃতি জলজ পুষ্পাবলী প্রস্ফুটিত হইয়া কি নয়ন তৃপ্তিকর আনন্দ দায়ক দৃশ্যই না প্রতিভাত করে। মহাপ্রভু পরমেশ্বর নাস্তিকদিগের চিন্তা শক্তি বিলুপ্ত করার জন্য শূন্যে শূন্য-লতার * জন্ম দিয়াছেন। ফলের উপরিভাগ মিষ্ট অথচ কোমল এবং অভ্যা-ন্তর ভাগ শক্ত। রোপণ করিবার অভিপ্রায়ে ফলের আঁটিগুলি শক্ত এবং বিস্বাদ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি সুস্বাদ হইত, তবে মনুষ্যেরা উদরসাৎ করিত। সা ইবিরিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ল্যাপল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড

* ত্রিপুরাস্থ হোমনাবাদ পরগণায় এক প্রকার লতা আছে, যাহা মৃত্তিকা ও বৃক্ষের আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া কুল বৃক্ষোপরি জড়াইয়া ধরে। তাহা-দিগকে শূন্য লতা বলে।

প্রভৃতি শীত প্রধান দেশের পশুগুলির লোম বেশী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পশুর লোম পাতলা, তথাকার অধিবাসীর খাদ্যও লঘুপাক বস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মৎস্য লঘু পথ্য, এজন্য তাহা দুর্ব্বল বাঙ্গালীর খাদ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শীত বাত বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিরাশ্রয় পশু পক্ষী-দিগের গাত্রে লোম ও পালক দিয়াছেন। কোমল চিংড়ি মৎস্যের গাত্রে কঠিন আবরণ দিয়াছেন। পশুর আহারের জন্য পৃথিবী ব্যাপিয়া সবুজ বর্ণ ঘাস দিয়াছেন। এইরূপ পরস্পর কৌশলময় কার্য্য দৃষ্টে হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই কৌশলময়; * তবে কোন কার্য্যে যে অকৌশল ও অমঙ্গল দৃষ্ট হয়, তাহার মর্ম্ম আমরা বুঝিতে অক্ষম। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহার কৌশল বিলম্বে প্রকাশ হয়। ঈশ্বর আমাকে আহার দেন মঙ্গ-লের জন্য, শাস্তি দেন মঙ্গলের জন্য, পীড়া দেন মঙ্গলের জন্য, দুঃখ দেন মঙ্গলের জন্য। যেমন শিক্ষক ছাত্রকে পাঠ অবহেলার জন্য শাস্তি দিলে এবং পিতা মাতা শিশুকে অনিষ্টকারী খাদ্য না দিলে এবং কুপথে যাইতে দেখিয়া প্রহার করিলে, (সন্তোষের পরিবর্ত্তে) বিষাদিত হয় এবং গালি দেয়, সেইরূপ আমরাও না বুঝিয়া পরমেশ্বরের কার্য্যে অমঙ্গল ভাবি। যে বস্তু যত প্রয়ো-জনীয়, সে বস্তু তত সুলভ, আর যে বস্তু যত অল্প প্রয়োজনীয়, সে বস্তু তত দুর্ল্লভ। লৌহ বড় প্রয়োজনীয়, অধিক পরিমাণে ব্যবহার না করিলে চলে না, এজন্য তাহা অতীব সুলভ। উহা যত ব্যবহার করিতে পারি, ততই সহজে পাই। যে দেশে যে বস্তুর উৎপত্তি অধিক, সে বস্তুর উপ-কারিতাও সেই দেশে অধিক। বাদাম, পেস্তা, আখরোট প্রভৃতি উষ্ণতা

---

* এক জন বট বৃক্ষ তলে বসিয়া ঈশ্বরের কার্য্য সমালোচনা করিয়া ভাবিতে লাগিল, ঈশ্বরের এ কেমন বিবেচনা। কুমড়া, লাউ প্রভৃতি সামান্য লতা মাত্র, অথচ ইহাদের ফল কত বড়; আর বট বৃক্ষ এমন প্রকাণ্ড, ইহাদের ফল কত ক্ষুদ্র। ঈশ্বরের সামঞ্জস্য বোধ নাই। এমন সময় হঠাৎ তাহার মস্তকে একটী বটের ফল পতিত হইল। তখন সে বলিয়া উঠিল, বুঝিয়াছি বাবা তোমার ভুল নয়, আমার ভুল। কুমড়া প্রভৃতি যেমন বড়, যদি সেই হিসাবে বট বৃক্ষের ফল বড় হইত, তবে আজ আমার মস্তকটী চূর্ণ হইত।

সাধক; এজন্য তাহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মে না। ইক্ষু, আনারস, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা প্রভৃতি শৈত্য সাধক; এজন্য ইহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রধান উৎপন্ন বস্তু। আবার শীত কালে যে সকল বস্তু জন্মে, তাহা উষ্ণবীর্য্য এবং গ্রীষ্ম কালে যে ফল জন্মে, তাহা শীতবীর্য্য গুণ বিশিষ্ট। বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন বস্তু দ্বারা মানব শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। যখন বায়ু কুপিত হয়, তখন বায়ু নিবারক বস্তু, আর যখন কফ কুপিত হয়, তখন কফ নিবারক বস্তু খাওয়ার প্রবৃত্তি জন্মে। ফলতঃ যে বস্তু যাহার অনুপকারী, সে বস্তু তাহার প্রাণে চাহে না। যাহা হউক, ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারি, এই বিশাল পৃথিবী কেবল মনুষ্য জাতির মঙ্গল সাধনার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে। নাস্তিক মানুন আর নাই মানুন, আমরা সগর্ব্বে মুক্তকণ্ঠে বলিব, জগতের প্রতি পরমাণু হইতে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব এবং অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। যদি কেহ বলেন, আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখি না কেন, * তদুত্তরে বলি, তুমি যোগ্য হইলে অবশ্য দেখিবে। রাজপ্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সহিত যে সে লোক সাক্ষাৎ করিতে পারে না; সাক্ষাৎ করিতে হইলে তদ্রূপ যোগ্যতার প্রয়োজন। দেখ, বায়ু ও প্রাণ এই দুইটী অদৃশ্য বস্তু, কিন্তু ইহাদের কার্য্য প্রযুক্ত বুঝিতে পারি, নিশ্চয়ই বায়ু ও প্রাণ এই দুইটী বস্তুর অস্তিত্ব আছে। ইহা অপেক্ষা ঈশ্বরের কার্য্য কত কোটি গুণ বড়। কিন্তু চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না বলিয়া কি বুঝিব যে, ঈশ্বর নাই। সক্রেটিস (সোক্রাত) প্লেটো (আফলাতুন) এরিষ্টটল (আরাস্তু) প্রভৃতি গ্রীস দেশীয় মহাজ্ঞানী পণ্ডিত মণ্ডলীও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। আর এক প্রমাণ এই যে, যে বস্তু বিদ্যমান আছে, সেই বস্তুর নামও পৃথিবীতে আছে। আর যাহা নাই, তাহার নামোল্লেখ হয় না। লোক বিপদ কালে ও অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া থাকে। ফলতঃ যত ধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে, সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব

* ঈশ্বর নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং ঈদৃশ বস্তু চর্ম্মচক্ষে কিরূপে দেখিবে? জ্ঞানচক্ষে অবশ্য দেখিতে পায়। ফলতঃ অদ্রষ্টব্য বস্তু মাত্রেই ঘোর ঘোর বলিয়া বোধ হয়।

স্বীকার করে না, তাহারা ধর্ম্মাবলম্বী শব্দে বাচ্য হইতে পারে না। নাস্তিকের অন্তঃকরণে কখনও শান্তি সুখ বিরাজিত নাই। মৃত্যু কালেও কোন কোন নাস্তিক ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া থাকে। যোসেফ বারকার নামক প্রধান নাস্তিকও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অন্তিম কালে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরের কোন ভৌতিক আকার নাই। ঈশ্বরকে নিরাকার বলিলে ইহা বুঝা যায় না যে, তাঁহার কিছুই নাই। তাঁহার যাহা আছে, তাহাই সমস্ত জগতের মূল কারণ। কিন্তু ইহা ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ বহির্ভূত। ভৌতিক বস্তু বা সৃষ্ট বস্তুর প্রতিই ইন্দ্রিয়গণের অধিকার। সৃষ্টির অতীত বস্তুর প্রতি ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তৃত্ব চলে না। ঈশ্বর সকলের স্রষ্টা; তিনি সৃষ্ট নহেন। সুতরাং তিনি সৃষ্টির অতীত। সৃষ্টির অতীত ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই। এজন্য তাঁহার নিকট ইন্দ্রিয়গণের কোন ক্ষমতা নাই। ইন্দ্রিয় আমাদের জ্ঞান লাভের প্রধান উপায়। যে স্থানে ইন্দ্রিয়ের কোন অধিকার নাই, সে স্থানে আমাদের জ্ঞানও অচল। তবে কি আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিতে অক্ষম? চিন্তা করিলেই প্রতীতি হইবে যে, আমরা তাঁহাকে অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না। জ্ঞান বাহ্য জগতের কার্য্য করিতে গিয়া যেমন ইন্দ্রিয়দিগের মুখাপেক্ষা করে, অন্তর্জগতেও তাহাকে তাহাই করিতে হয়। ঈশ্বরের নিকট যাইতে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে পরম্পর সম্বন্ধে; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। প্রথম ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বাহ্য বস্তু, বাহ্য বস্তুর সাহায্যে আত্মা; আত্মার সাহায্যে পরমাত্মাকে পাইয়া থাকি। ইহাতেও ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ রূপে জ্ঞানের আয়ত্ত। এ কথার কোন বাধা উপস্থিত হইল না। কারণ বাহ্য জ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান যেমন যুগপৎ প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, তেমন আত্ম-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়।

পণ্ডিত কোমত বলেন, নিয়মেই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপার চলিতেছে। নিয়ম ভিন্ন কিছুই হয় না ও হইতে পারে না, এবং নিয়ম ভিন্ন মনুষ্যের জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই। যেমন বিদ্যুৎ নির্ঘোষিত হয় নিয়মে, পক্ষী সকল উড়িয়া যায় নিয়মে, কুলায় নির্ম্মাণ করে নিয়মে, ডিম্ব প্রসব ও শাবক পোষণ করে নিয়মে, অগ্নি প্রজ্জলিত হয় নিয়মে। সুতরাং আমরা কোমতের শাসন

মাঙ্গ করিতে পারি না। কেন না, উৎপন্ন বলিলে উৎপাদক, সৃষ্টি বলিলে স্রষ্টা, নিয়ম বলিলে নিয়ন্তা, স্বাভাবিক রূপে আসিয়া পড়ে। আর বলি, নিয়ম ভিন্ন মনুষ্যের অতি সহজ জ্ঞাতব্য নিয়ন্তা। নিয়ন্তাই প্রকারান্তে ঈশ্বর।

এস্থলে ইহা বলা অত্যুক্তি নহে যে, আত্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানের কুঞ্জি। যিনি নিজকে চিনিয়াছেন, তিনি নিরঞ্জনকে চিনিয়াছেন। যিনি খোদকে চিনিয়াছেন, তিনি খোদাকে চিনিয়াছেন। মনুষ্য আপন অস্তিত্ব হইতে বিশ্বকর্ত্তা খোদাতাআলার অস্তিত্ব জানিতে পারে; স্বীয় গুণ দেখিয়া খোদাতাআলার গুণ চিনিতে পারে। মনুষ্য আপন শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপ রাজত্বের উপর যে প্রকার প্রভুত্ব ও ক্রিয়া পরিচালনা করে, তাহা দেখিয়া সমস্ত বিশ্ব জগতের উপর সৃষ্টিকর্ত্তার প্রভুত্ব ও ক্রিয়া কিরূপে পরিচালিত হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আত্মা যেমন দেহের বাদশাহ স্বরূপে অধিষ্ঠান করিতেছে, দেহ ও দেহস্থিত সমস্ত আকার বিশিষ্ট পদার্থও তদ্রূপ আত্মার আজ্ঞায় চলিতেছে,—অথচ নিজে নিরাকার। সেইরূপ বিশ্ব জগতের বাদশাহ খোদাতাআলা স্বয়ং নিরাকার ও অচিন্ত্য হইয়া এই জড়ময় বিশ্ব জগৎ চালাইতেছেন। খোদাতাআলা যদিও সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান, তথাপি কোন এক বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নহেন। আমাদের জীবনও কোন এক বিশেষ অঙ্গে আবদ্ধ নহে। জীবন না হস্তের মধ্যে, না পদে, না অন্য কোন অঙ্গেই বর্ত্তমান। দেহের সকল অঙ্গ বিভক্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রাণ বিভক্ত হইতে পারে না। কেন না, যদি সমাবেশ হইতে পারিত, তবে উক্ত বিভাজ্য পদার্থের সহিত উহাও বিভক্ত হইয়া যাইত। সুতরাং ইহাতে বুঝা যাইতেছে, কোনই অঙ্গে প্রাণের সমাবেশ নাই। কিন্তু পক্ষান্তরে কোন অঙ্গই প্রাণের অধিকার হইতে বহির্ভূত নহে। জীবন সমস্ত দেহের বাদশাহ। খোদাতাআলা কোন এক বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নহেন। সমস্ত বিশ্ব জগৎ খোদাতাআলার পরিচালনাধীনে আছে।

ক্রমে বিকাশ স্বীকারকারী ব্যক্তিগণ evolutionist বলেন, প্রাকৃতিক প্রত্যেক বস্তুই সুবিধা এবং ঘটনাক্রমে, ক্রমে ক্রমে বিকাশ হইয়াছে। তাহারা ঈশ্বরের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তদনুসারে আমি বলিতে পারি, আগ্রার তাজমহল যাহা বহুদিনে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে নির্ম্মাতার

অস্তিত্বের কোন পরিচয় দেখা যাইতেছে না। ঐ গৃহটী অকস্মাৎ পৃথিবী হইতে উত্থিত হয় নাই। আমি বলি, তাহার নির্ম্মাতা নাই। ইষ্টকগুলি ক্রমশঃ নির্ম্মিত, সংগৃহীত এবং সুসজ্জিত হইয়াছে। কড়ি কাষ্ঠ আস্তে আস্তে আনীত হইয়াছে। যদি তাহারা বলেন, তাজমহলের নির্ম্মাতা আছে, তবে আমাদেরও নির্ম্মাতা ঈশ্বর আছেন। ক্রম বিকাশবাদীরা আরও বলেন, মনুষ্য প্রথমে বানর ছিল; পরে কালক্রমে লাঙ্গুল খসিয়া গিয়া মানবাকৃতি ধারণ করিয়াছে। মনুষ্যেরা প্রথমতঃ চতুষ্পদে বিচরণ করিত, পরে ক্রমশঃ দ্বিপদে হাটিতে শিখিয়াছেন ইত্যাদি। ডারউইন সাহেব এই মতের প্রচারক ছিলেন। * মানব শরীরের অবয়বগুলি যে ভাবে সংযোজিত আছে, তাহা দেখিলে যে ইহা সৌন্দর্য্যজ্ঞ কোন বুদ্ধির সাহায্যে হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অবয়বের মধ্যে যে গুলির সংখ্যা এক, তাহারা দেহের ঠিক মধ্যস্থলে সংন্যস্ত, কিন্তু যে গুলি সংখ্যায় দুইটী তাহারা দুই ধারে সমান দূরে সংস্থাপিত; যথা—নাসিকা, ওষ্ঠ, চিবুক, গাল, বক্ষঃস্থল, নিম্নভাগ নাভি ইত্যাদি সংখ্যায় একক হওয়াতে শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে সংস্থাপিত। সেইরূপ ভ্রূ, চক্ষু, গণ্ড, হস্ত, স্তন ইত্যাদি সংখ্যায় দুই হওয়াতে উক্ত মধ্যস্থলস্থ অঙ্গ হইতে দুই প্রান্তে সমান দূরে অবস্থিত। এইরূপে সমুদয় অঙ্গগুলি সুসজ্জিত রূপে আবদ্ধ হওয়াতে কি পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। সুতরাং কোন সৌভাগ্য পুরুষের অসামান্য চিন্তা ইহাদের মূলে কি স্পষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু যে স্থলে চিন্তা তথায় মন এবং এই অসামান্য মনই ঈশ্বর।

ধার্ম্মিক চূড়ামণি মহাত্মা থিওডার পার্কার বলেন, আমাদের মনে যত-

---

* আমরা যদি কোন যন্ত্র অবলোকন করি, এবং উহার উপযোজ্যতা স্পষ্ট দেখিতে পাই, তবে আমাদের মনে সহসা এই ভাবের আবির্ভার হয় যে, উক্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ কোন চিন্তার উপর নির্ভর করিতেছে। অগ্রে চিন্তা, তৎপরে যন্ত্রের আবির্ভাব। যে স্থানে যেরূপ কৌশল দেখা যায়, তাহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে তাহা কোন ব্যক্তি দ্বারা চিন্তিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। সেইরূপ এই জগন্মণ্ডলে যাহা কিছু অবলোকিত হয়, সমুদয়ই চিন্তার বিষয় বোধ হয়। মনুষ্য শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি এমনি ভাবে গঠিত যে, তাহা স্থির করা যে কিছু অসামান্য বুদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা যে ব্যক্তি একবার চিন্তা করেন, তিনিই বুঝিতে পারেন।

গুলি প্রবৃত্তি আছে, বাহিরে তাহাদের বস্তু অবলোকিত হয়। আমাদের মানসে দয়া আছে, বাহিরে দয়ার বস্তু আছে; ক্রোধ আছে, ক্রোধের বস্তুও আছে; ভয় আছে, ভয়াবহ বস্তুও রহিয়াছে; হিংসা আছে, হিংসোদ্দীপক নানাবিষয়ও আছে। বস্তুতঃ বিষয় হীন প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না।

যখন সকল প্রবৃত্তির এক একটী বিষয় আছে, তখন কেবল অলৌকিক কোন পুরুষের প্রতি ভক্তি প্রবৃত্তির বিষয় নাই, ইহা যুক্তিতেই আইসে না। যখন হৃদয়ে মাতৃভক্তি আছে, এবং উহার পাত্র মাতা জগতে আছেন দেখিতে পাই, তখন মানসে ঈশ্বরভক্তি রহিয়াছে, অথচ ঈশ্বর নাই, ইহা বিবেচক মাত্রেই অস্বীকার করিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের পরিচয় ও গুণ।

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি সকলকে দেখেন। তিনি আকাশ মর্ত্ত্য পাতাল চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, চেতন, অচেতন সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় অপরূপ, অতুলনীয়; তিনি একমাত্র পূজনীয়। তিনি ভিন্ন আর কিছু পূজনীয় নাই, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, সংহার-কর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা; তাঁহার নিকট মানবগণ পাপ পুণ্যের জন্য দায়ী। তিনি মৃত ব্যক্তিদিগকে পরকালে পুনর্জ্জীবিত করিয়া পুণ্যাত্মা-দিগকে স্বর্গবাসী ও পাপীদিগকে নরকস্থ করিবেন। তিনি শাস্তিদাতা, আহারদাতা, সর্ব্বশক্তিমান্, পতিতপাবন, বিপদ-নাশন, বিপদ-তারণ; তাঁহার আদেশ ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না। এমন কি, একটী বালুকা কণাও স্থানান্তরিত হইতে পারে না। তিনি লোকের অদৃষ্টলিপির লেখক, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ও পৃথিবী ইত্যাদি সমুদয় পদার্থের ধ্বংস সাধন করিতে পারেন। ঐরূপ মুহূর্ত্ত মধ্যে পত্তন করিতে পারেন। তিনি নিজ ক্ষমতায় প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটকে ভিক্ষুক করিতে পারেন এবং ভিক্ষুককে সম্রাট্ করিতে পারেন। তিনি মানবের অন্তরের সংবাদ রাখেন। তিনি পরম দয়ালু, দাতা; তাঁহার দয়া ব্যতীত মানবের মুক্তি নাই। তাঁহার দয়াই আমাদের একমাত্র ভরসা স্থল। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না. তিনি কেহ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি পবিত্র, তিনি একমাত্র অহঙ্কারের যোগ্য। তাঁহার মৃত্যু নাই, তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব নাই, সকলই তাঁহার দাস। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় জানেন। সুতরাং স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তার আরাধনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য কার্য্য ও তাঁহার অভিপ্রেত। ঐশ্বরিক আদেশ পালন বা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নাম ধর্ম্ম। জগতে

নানাধর্ম্ম প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে প্রধান এই কয়টী, যথা—মুসলমান ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম, নানকপন্থী ধর্ম্ম, অগ্ন্যুপাসক ধর্ম্ম এবং জড়োপাসক।

মুসলমান ধর্ম্ম।

মুসলমান ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই। মোহাম্মদ (দরূদ) তাঁহার শেষ প্রেরিত সত্য তত্ত্ববাহক দাস। এই ধর্ম্মে সাকার দেব দেবীর উপাসনা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রশংসিত প্রেরিত মহাপুরুষ আমাদিগকে পাপ হইতে বিরত থাকিয়া, পুণ্য কার্য্যে ব্রতী করার জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার আনুগত্য স্বীকার এবং সেই জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। পাপ পুণ্যের জন্য মানবগণ ঈশ্বরের নিকট দায়ী। পাপ করিলে নরকে, পুণ্য করিলে স্বর্গে যাইতে হইবে। হজরত দাউদ David, হজরত মুসা Moses, হজরত ইসা Christ এবং হজরত মোহাম্মদের প্রতি ক্রমশঃ ৪ খানা ধর্ম্ম পুস্তক ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩ খানা রহিত এবং শেষাবতীর্ণ কোরাণ এখন বলবৎ আছে। স্বর্গীয় দূতগণের শাসন ক্ষমতা পৃথিবী ধ্বংস সাধন, মৃত্যুর পর শেষ বিচারার্থে পুনর্জ্জন্ম দান, এমন কি সমুদয় জীব জন্তুর জন্ম মৃত্যু আয়ু উপজীবিকাদি সমুদয় ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত। ভবিষ্যৎ কথা ঈশ্বর ব্যতীত কেহই জানে না। মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর মুক্তি নাই। মুসলমান ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। যে ঈশ্বরের আরাধনা করিবে, সেই ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র, আত্মা অমর, মুসলমানগণ পরস্পর ভ্রাতা এবং এক জন অন্য জনের সাহায্য করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। মুসলমান ধর্ম্মে পৌরহিত্য ও শাস্ত্রাধ্যাপনাধিকার কোন জাতি বিশেষের প্রতি একচেটিয়া ন্যস্ত নহে। যে ইচ্ছা করিবে, সেই শাস্ত্র পড়িতে কি শিক্ষা করিতে পারিবে। হজরতের বংশাবলী (সৈয়দদিগের জন্য) কোন শাস্ত্রিক ক্রিয়া আবদ্ধ নাই। দায়ভাগে কাহাকেও বঞ্চিত করে না। ৫টী বিষয়ের উপর মুসলমান ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত। ১। কলেমা পাঠ। ২। দৈনিক পঞ্চ নমাজ। ৩। বার্ষিক ৩০টী রোজা (উপবাস)। ৪। ধনীর জন্য স্বীয় ধনের $\frac{1}{40}$ ভাগ দরিদ্রকে দান (জাকাত)। ৫। হজ্জ। মুসলমান ধর্ম্মে ঈশ্বরের আংশিক অর্চ্চনা

নাই। অর্থাৎ ঈশ্বরের অংশ জানা ঘোরতর পাপ, ঈশ্বর আহার করেন না, জন্ম দেন না কি জাত হন নাই। তিনি একমাত্র ভাগ্য বিধাতা, তিনি পালন কর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা জন্মদাতা ও আহারদাতা। তাঁহার আদেশ ব্যতিত কোন কার্য্য হইতে পারে না। সুরা পান, পরদার গমন, পর দ্রব্য হরণ, মিথ্যা বলা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, সুদ গ্রহণ, জুয়া খেলা, ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইস্‌লাম ধর্ম্মে বিধবা বিবাহ ও ত্বক্‌চ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। কারণ বশতঃ এক হইতে চারি বিবাহ করা এবং ঈশ্বরোদ্দেশে কোরবাণীর (পশু জবেহ করিয়া ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করা) বিধান রহিয়াছে। এই ধর্ম্মে তালাকের (স্ত্রী ত্যাগ) ও বিধান আছে। আর যে শ্রেণীর লোক হউক না কেন, সে মরিলে গ্রামবাসী সমুদয় মুসলমান তাহাকে সমাধিস্থ করিতে বাধ্য। স্বধর্ম্মাবলম্বী কি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রতিবাসীর সাহায্য করার কথা লিখিত আছে। মুসলমানগণ প্রধানতঃ ২ ভাগে বিভক্ত; যথা—সুন্নি ও সিয়া। সুন্নিগণ ধর্ম্ম কর্ত্তার সুন্নতের (দ্রষ্টব্য' কার্য্যের) সম্পূর্ণ অনুসরণকারী এবং হানিফি, মালেকি, শাফেই, হাম্বলি, এই ৪ মজহবের অধীনতা স্বীকার করে। ইহারা প্রেরিত মহাপুরুষের ৪ খলিফার (প্রতিনিধি) প্রাধান্য স্বাকার করেন। সুন্নিদের মধ্যে আরও বহুতর উপশাখা আছে; যথা—খারেজী, কদরিয়া ও ওহাবী প্রভৃতি। যাহারা নজদ নিবাসী মোহাম্মদ বিন্ আবদুল ওহাবের মতানুসরণকারী এবং ৪ মজহবের অধীনতা স্বীকার করেন না, তাহারা ওহাবী; আর যাহারা নমাজে রুকুর পর প্রত্যেক বার হস্ত উত্তোলন করে, তাহারা রফায়দান বা লা-মজহাবী। ইহারা ওহাবিদিগেরই একাংশ বিশেষ। যাহারা হজরতের সুন্নতের সম্পূর্ণ মতানুসরণ করে না, এবং হজরত আলি (রাজি) ব্যতীত ৩ আছহাবের প্রাধান্য স্বীকার করে না, তাহারাই শিয়া বা রাফেজী। শিয়াদের মধ্যেও নানা শাখা আছে। ইস্‌লাম ধর্ম্মের কালক্রমে ৭৩ শাখা হইবে। তন্মধ্যে এক শাখা সুন্নত জমাত নাজি (স্বর্গবাসী) হইবে এবং সমস্ত ৭২ শাখা নারী (নরকগামী) হইবে। সমগ্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূল এলমে মারফত বা যোগ শাস্ত্র। যোগশাস্ত্রে দীক্ষিত না হইলে প্রকৃত মুসলমান হয় না। আধ্যাত্মিক জগতে কস্মিন কালেও জ্ঞান জন্মে না এবং ঈশ্বরকে প্রকৃত রূপে চিনে না। যাহা হউক, বাহুল্য বিবেচনায় ৭২ ফেরকার

(শাখার) বিস্তারিত এই গ্রন্থে লিখিত হইল না। বড় বড় গ্রন্থে তাহা দ্রষ্টব্য।

ীয় ধর্ম্ম।

যীশুখ্রীষ্ট মেরীর (মরিয়ম) তনয় ছিলেন। তিনি অলৌকিক শক্তিশালী ছিলেন বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। যে গ্রন্থে এই বিশ্বাস লিপিবদ্ধ আছে, তাহা বাইবেলের নূতন প্রমাণ বলিয়া অভিহিত। * খ্রীষ্টিয়ানদিগের মতে এই গ্রন্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যোসেফের সহিত মেরী বাগ্দত্তা হইয়াছিলেন। তাহাদের সম্মিলনের পূর্ব্বে মেরী অন্তঃস্বত্বা হইয়াছিলেন। তৎপর যোসেফ তাহার সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্গীয় দূত স্বপ্নাবস্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মেরীকে পরিত্যাগ না করিবার জন্য উপদেশ দিলেন এবং সন্তানের নাম যীশু রাখিতে বলিলেন। যোহন, মথি, মার্ক ও লূক যীশুর মৃত্যুর পর নূতন প্রমাণ নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। যদিও তাঁহাদের লিখায় ঐক্য দেখা যায়, তথাপি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ হইতে কোন উপদেশ পাওয়া যায় না। যীশু কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিবার জন্য ৩৬৩ খ্রীঃ অব্দে এশিয়ামাইনরে একটী মহতী সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, কেবল উল্লিখিত ৪ ব্যক্তির লিখা সত্য; অন্যান্যগুলি মিথ্যা। যোহনকর্ত্তৃক যীশু জল দ্বারা বাপ্তাইজ (ধর্ম্মে দীক্ষিত) হইয়াছিলেন। পাইলেট নামক রাজা ক্রুশের দ্বারা যীশু খ্রীষ্টের হাত বিদ্ধ করিয়াছিলেন। কবর দেওয়ার তৃতীয় দিন মেরী যীশুকে দেখিয়াছিলেন। যখন জগতের বিনাশ কাল উপস্থিত হইবে, তখন তিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন। তিনি মেঘমালা সহ আসিবেন এবং মৃত ব্যক্তিদিগকে কবর হইতে উঠিতে বলিবেন এবং তাহাদের বিচার করিবেন। তিনি এখন একটী সমুন্নত সিংহাসনে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন এবং স্বর্গ ও নরকের চাবি তাঁহার হাতে রহিয়াছে। যীশু ৫ খানা রুটী, ২টী মৎস্য দ্বারা স্ত্রীলোক

* ভূতপূর্ব্ব খ্রীষ্টান মিসনরি জন জনিরদ্দি লিখিয়াছেন, হিব্রু বাইবেলের সহিত গ্রীক্ বাইবেলের ঐক্য নাই।

ও সন্তানগণ ব্যতীত আরও প্রায় ৫০০০ হাজার পুরুষকে খাওয়াইয়া ছিলেন। ইহাতে সকলেরই উদর পূর্ণ হইয়াছিল, এবং যাহা ভুক্তাবশিষ্ট ছিল তদ্দ্বারা দ্বাদশটী বাজরা পূর্ণ করিয়াছিলেন। জন স্বর্গে যাওয়ার সময় এই সকল দেখিতে লাগিলেন। স্বর্গে ১টী সিংহাসন স্থাপিত রহিয়াছে এবং তদুপরি চতুর্দ্দিকে একটী রামধনু সহ এক জন উপবিষ্ট আছেন এবং তথায় ২৪টী আসন রহিয়াছে, সিংহাসন সম্মুখে ৭টী প্রদীপ জ্বলিতেছে। তথায় বহু সংখ্যক পান পাত্র রহিয়াছে; এবং ৪টী পশু আছে, তাহাদের সম্মুখে এবং পশ্চাতে চক্ষু আছে। একখানা গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহাতে ৭টী মোহর করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ও পৃষ্ঠদেশে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল যীশুই পড়িতে পারেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম মতে ঈশ্বর ৩টী ভিন্ন রূপে বিরাজিত; যথা—পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা। যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। পিতার কার্য্য পৃথিবীর সৃষ্টি এবং পালন করা, পুত্রের কার্য্য পাপীদিগকে উদ্ধার করা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেওয়া। পবিত্রাত্মার কার্য্য লোককে ধর্ম্মপথে আনয়ন করা। বাইবেলে লিখা আছে, যীশু উপাসনা, প্রার্থনা ও উপবাস করিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম মতে প্রত্যেক রবিবারে গির্জ্জায় গিয়া হাঁটু পাতিয়া আরাধনা করার রীতি প্রবর্ত্তিত আছে। ৩ স্বর্গে, ৩ মর্ত্তে। খ্রীষ্টানগণ ২ ভাগে বিভক্ত। রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্টাণ্ট। রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বিরা হিন্দুর ন্যায় মৃত সাধুদিগের ছবি ও কবরের পূজা করে, প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বিরা তাহা করে না এবং রোমান ক্যাথলিকদিগকে প্রতিমা পূজক বলিয়া উল্লেখ করে। আমার ইচ্ছামত না হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা মতে সমুদয় কার্য্য হউক, এই প্রকার নীতি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে আছে। ক্যাথলিক খ্রীষ্টানেরা মাতা মেরীর ভজনা করে এবং ভজনালয়ে তাহার প্রতিমূর্ত্তি রাখে। যীশু পিটরের (রোমান ক্যাথলিকের ধর্ম্মাধ্যক্ষ) নিকট স্বর্গের চাবি দিয়া এই বলিয়াছিলেন যে, যাহাকে তুমি ইচ্ছা কর স্বর্গে প্রবিষ্ট করাইতে পারিবে, তদন্যথা কেহ স্বর্গে যাইতে পারিবে না, কিন্তু পিটরের প্রতিনিধি পোপের নিকট যে স্বর্গের চাবি আছে, প্রোটেষ্টাণ্টগণ একথা স্বীকার করে না। তুরস্ক সাম্রাজ্যর অন্তর্গত বয়তলহাম নগর যীশু খ্রীষ্টের জন্মস্থান। রোমান ক্যাথলিক পুরহিতেরা যাবজ্জীবন বিবাহ করিতে পারে না। খ্রীষ্টানদিগের আরাধনার জন্য কোন বাঁধাবাঁধি সময় নির্দ্ধারিত নাই।

য়িহুদী ধর্ম্ম।

য়িহুদিগণ ঈশ্বরকে জীবন্ত, নিত্য ক্রিয়াশীল, বাগ্ময় ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। যে গ্রন্থে এই বিশ্বাস লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পুরাতন প্রমাণ নামে অভিহিত। ঈশ্বর সম্বন্ধে ধ্যান মননাদি বিষয় এবং মনুষ্য কিরূপে তাহার চিন্তা ও ধারণা করিবে, এতৎ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে কিছুই লিখিত হয় নাই, ঈশ্বর সম্বন্ধে সুধু নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে।

ঈশ্বর কোন ক্রম অবলম্বন করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মনুষ্যকে স্বীয় প্রতিমানুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মনুষ্যকে একটী উদ্যানে স্থাপিত করিয়া তৎস্থিত নিষেধিত বৃক্ষের ফল ভক্ষণে নিবারণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পাপ জানিতে পারিয়া তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত করিয়াছিলেন ও তাহাকে সুখী করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন। তিনি সারা ও জারার তাবুতে যাতায়াত করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম, মোজেস ও অন্যান্যের নিকট মানব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন এবং সিনাই পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া মোজেসের প্রতি দশটী আদেশ প্রচারিত করিয়াছিলেন। তিনি যাকোবের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন, নরহত্যাকারীকে শাস্তি দিয়াছিলেন, এবং পৃথিবীতে মহা জলপ্লাবন সংঘটন করিয়াছিলেন। তাহাতে নোয়া ব্যতিত আর সকলেই বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি তৎকালে তাহার করুণার প্রতিভূ স্বরূপ রাম ধনু প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি আট্টালিকা নির্ম্মাতাদিগকে নির্ব্বাক্ করিয়া চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি এব্রাহিমকে এরূপ একটী স্থানে বাস করিতে আদেশ করিলেন যে, তথায় থাকিলে সমস্ত মানব পরিবার তাহার দরুণ সুখে বাস করিবে।

তিনি চুক্তি স্বরূপ তাহাকে একটী পুত্র প্রদান করিলেন, এবং পিতার বিশ্বাস পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি আইসাক ও য্যাকুবের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন। মনুষ্যদিগকে ক্রীতদাস করিয়াছিলেন। তিনি ভোজ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তিনি ঈজিপ্টবাসী পলাতকগণকে মান্না নামক খাদ্য দ্বারা খাওয়াইয়াছিলেন। তাহারা তৃষ্ণার্ত্ত হইলে শৈল বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ যোগে তাহাদের প্রতি আইন প্রচার করিতেন। ঈশ্বর জগৎ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত

সৃষ্টি করিয়া ক্লান্তি বোধ করিলেন এবং সপ্তম দিবস বিশ্রাম করিলেন। এই দিনে মনুষ্যগণ কার্য্য হইতে বিরত থাকে। ঈশ্বর একদা একটী উদ্যানে সান্ধ্য স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার বাণী শ্রুত হইয়াছিল এবং ঈশ্বরের আত্মা জল ও স্থলের উপর বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছিল। ইস্রেল বংশীয়েরা পুরাতন প্রমাণ সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। যদিও যীশু য়িহুদী ছিলেন, তথাপি য়িহুদিগণ তাহাকে ঈশ্বরের একমাত্র প্রসূত পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত না এবং যীশু কবরে প্রোথিত হওয়ার পর তৃতীয় দিন কবর হইতে উঠিয়া আকাশে উঠিয়াছিলেন এবং এখন ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, খ্রীষ্টিয়ানদিগের এই বিশ্বাস য়িহুদিগণ স্বীকার করে না। তাহারা বলে যে, যীশুর মৃতদেহ তাহার শিষ্যগণ কবর হইতে রাত্রে চুরি করিয়াছিল। তাহারা কবর হইতে মৃতদেহের পুনরুত্থান বিশ্বাস করে না। যীশু যে আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিতেন, তাহাতে য়িহুদীরা তাহাকে তিরস্কার করিত। যীশু আপনাকে কখন ঈশ্বরের পুত্র, কখন বা মনুষ্যের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিতেন। য়িহুদিদিগের আরাধনার নাকি সময় নির্দ্দিষ্ট আছে।

পারসিক ধর্ম্ম বা অগ্ন্যুপাসক।

পারসিকদিগের ধর্ম্মের সংস্থাপক জেরাদেশ বা জেরেষ্টার। ধর্ম্ম পুস্তকের নাম জেন্দাবেস্তা। অন্ধকার এবং আলো এই দুই বিষয়ই তাহাদের ধর্ম্মের সার। আলো এবং অন্ধকারের উপর প্রভু আছেন। আলোর কর্ত্তার নাম এমরজদ এবং তাহা হইতে সমুদয় আলো আসে। অন্ধকারের কর্ত্তার নাম এরহিমা। অন্ধকারের কর্ত্তাপেক্ষা আলোর কর্ত্তা বলবান্। সুতরাং যুদ্ধে আলোর কর্ত্তার জয় হইয়া থাকে। আলোর কার্য্য ন্যায় এবং অন্ধকারের কার্য্য অন্যায়। তাহারা, শব দাহ কি প্রোথিত করে না। শব অনাবৃত ভাবে কবরস্থানে রক্ষিত হয়। মৃত ব্যক্তির দক্ষিণ চক্ষু শকুনী ভক্ষণ করিলে পুণ্যের লক্ষণ মনে করে। তাহারা অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকে। জেন্দাবস্তায় অনন্ত নরকের মত নাই। পার্সিরা অনন্ত নরক করে না। জেন্দাবস্তার মতে আত্মা নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নির্ম্মল হয়।

হিন্দু ধর্ম্ম।

হিন্দুরা স্বহস্তে নির্ম্মিত দেব দেবী পূজা করে। তাহারা প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। শাক্ত ও বৈষ্ণব। বৈষ্ণবেরা প্রাণী বধ করে না, নিরামিষ ভোজন করে। শাক্তেরা সুরা পান এবং বলিদান করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই ৩ মূর্ত্তিমান ব্যক্তিবিশেষকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করে। পরমেশ্বরের বহুলাবতার স্বীকার করে। হিন্দুরা প্রধানতঃ ৪ জাতিতে বিভক্ত, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পা হইতে শূদ্রের জন্ম হইয়াছে। ব্রাহ্মণের জজন যাজন পৌরহিত্য, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ বিদ্যা, বৈশ্যের হল কর্ষণ এবং শূদ্রের দাসত্ব কার্য্য। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি বেদ অধ্যয়ন করিলে নরকস্থ হইবে। ব্রাহ্মণের সংস্রব ব্যতীত কোন ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদন হয় না। এক জাতি অন্য জাতির অন্ন ভক্ষণ করে না। ঈশ্বর মনুষ্যাকৃতি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কোন কোন মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। জল, বায়ু, অগ্নি, রাজা, সূর্য্য এবং যোদ্ধাদিগকেও হিন্দুরা উপাসনা করিয়া থাকে। হিন্দু ধর্ম্মে সুরাপান, দেবতার সম্মুখে মনুষ্য বলিদান করা, জলে শিশু নিক্ষেপ, মৃত স্বামীর সহিত জীবিত স্ত্রীর সহমরণ বিধান আছে। কোন কোন পুস্তকে হিমালয় পর্ব্বতকে স্বর্গরাজ্য বলিয়া লিখিত আছে। বেদে ৩৩ জন দেবতার নামোল্লেখ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দু জাতি ৩৩ কোটি দেবতার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিন্দুরা শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নামক ঘোষ তনয়, রাধিকা নাম্নী সুন্দরী গোপতনয়াকে লইয়া কুৎসিত লীলা খেলা করিয়াছিলেন। হিন্দু জাতি সম্পত্তি বণ্টনে পুত্র বর্ত্তমানে কন্যাকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া থাকে। পৌরাণিক হিন্দুগণ বিধবা বিবাহকে পাপের কার্য্য মনে করে, মৃত দেহকে অপবিত্র জানে, এক জাতির শব অন্য জাতি স্পর্শ কি দাহ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। স্বয়ং বিষ্ণু রাজা দশরথের ঔরষে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাম রূপ ধারণ করেন। তাহার স্ত্রী সীতাকে হরণ করার অপরাধে, তিনি লঙ্কাধিপতি মহারাজ দশাননকে বধ করেন। পাপ পুণ্যের পরিমাণানুসারে মনুষ্য পুনঃ পুনঃ জন্ম ধারণ করে। গরুকে বিষ্ণু, জলকে নারায়ণ এবং গো-বিষ্ঠাকে পবিত্র মনে করে। বেদ, ভাগবৎ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র এই চারিটী বিষয়ের উপর হিন্দু ধর্ম্ম

সংস্থাপিত। বেদ হিন্দুর প্রধান ধর্ম্ম পুস্তক, বেদ প্রধান (ব্রহ্মার বাণী) তন্নিম্নে স্মৃতি, তৎপর পুরাণ। যে স্থানে বেদ স্মৃতির পরস্পরর অনৈক্য হইবে, সে স্থানে বেদই প্রমাণ। হিন্দুরা দিবা রাত্রিতে ৩ বার ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে; যথা—প্রাতঃ ক্রিয়া, মধ্যাহ্ন ক্রিয়া এবং সায়ং ক্রিয়া। হিন্দুরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মে আহ্বান করিতে পারে না।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মেরা নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে। তাঁহারা স্বহস্তে নির্ম্মিত মূর্ত্তি পূজাকে ঘৃণা করেন, তাঁহারা বলিদান করেন না। জাতি-ভেদ স্বীকার করেন না। রাজা রামমোহন রায় এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। ইহা সকল ধর্ম্মের সার নির্ব্বাচিত। বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কোন ধর্ম্ম পুস্তক নাই। মুসলমানেরা যেমন ধর্ম্ম কর্ত্তার মধ্যবর্ত্তিতা স্বীকার এবং আবশ্যকতা মনে করেন, ব্রাহ্মেরা তেমন কোন প্রেরিত পুরুষের আবশ্যকতা ও মধ্যবর্ত্তিতা স্বীকার করেন না। যদিও নববিধানী ব্রাহ্মগণ প্রেরিত পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাহাদের আচার্য্য বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে একজন প্রেরিত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন। মানব জাতির প্রাণ অমর। মরিলে পর গাত্রোত্থান কি পরলোকে দেহ ধারণ করার কথা স্বীকার করেন না। বিবেকই তাহাদের ধর্ম্মবিষয়। ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। পাপ পুণ্যের জন্য মানবগণ ঈশ্বরের নিকট দায়ী। পাপ পুণ্যের তিরস্কার পুরস্কার পরলোকে আছে বলেন। কোন ধর্ম্ম পুস্তককে অভ্রান্ত মনে করেন না। ক্রমশঃ বিবেক * যোগে সত্য প্রকাশ হইবে মনে করেন। তাঁহাদের মতে উপাসনার সময় নির্দ্ধারিত নাই।

ব্রাহ্মেরা কাহাকে ঘৃণা করেন না। সকলকে স্বধর্ম্মে আহ্বান করেন। সুরা পান, পরদার গমন, মিথ্যা বলা, চুরি করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, কপটতা প্রভৃতি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে।

ইহাদের মতে বাল্য বিবাহ দোষণীয়। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন না। ভিন্ন জাতির হস্তে খাইতে নিষেধ নাই। এক ঈশ্বরকে সৃজন কর্ত্তা, আহারদাতা, রক্ষাকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা বলিয়া জানেন। তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন মূর্ত্তি বিশেষকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন না। পাপ পুণ্যের পরিমাণানুসারে পরলোকে আত্মা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

গৌতম বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। কুসংস্কার বর্জ্জিত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ তিনি পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র এবং প্রিয় আত্মীয়াদি সহ সংসার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী। বৌদ্ধগণ প্রথমতঃ পৌত্তলিকতা ও জাতি বিচার পরিহার পূর্ব্বক বিশুদ্ধ জ্ঞানের অর্চ্চনা করিতেন। বৌদ্ধদিগের দর্শন শাস্ত্রে নিম্নলিখিত অষ্টাবিংশ গুণের বিষয় লিখিত আছে ; যথা, চারি ভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ। পঞ্চেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, দেহ। জড় পদার্থের পঞ্চ গুণ—আকার, শব্দ, ঘ্রাণ, স্বাদ, সারাংশ। দুই জাতি পুরুষ ও স্ত্রী। তিনটী মূল অবস্থা—চিন্তা, জীবনী শক্তি ও স্থান। মনোভাব প্রকাশক দ্বিবিধ উপায়—ইঙ্গিত ও বাক্য। সজীব পদার্থ নিচয়ের সপ্ত গুণ—স্থিতি স্থাপকত্ব, কার্য্যোপযোগীত্ব, একীকরণত্ব, স্থায়ীত্ব ধ্বংস ও পরিবর্ত্তন। ইন্দ্রিয় সকল ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ; যথা—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পদার্থ সমূহের জ্ঞান সঞ্চার, ষষ্ঠতঃ, স্মৃতির সাহায্যে মন দ্বারা পদার্থ নিচয়ের জ্ঞান উপলব্ধি। পদার্থ সমূহের গুণের অনুভূতিগুলিকে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যানুসারে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ; যথা, পদার্থ সমূহের অম্লত্ব ও মিষ্টত্বের অনুভূতিগুলিকে স্বাদের শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছে। বৃক্ষ লাল বর্ণ ও গৃহ ইত্যাদিকে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উত্তাপ শৈত্যাদিকে স্পর্শনের ও উচ্চ মৃদু শব্দ ইত্যাদি শ্রবণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও নিম্নলিখিত বিবিধ মনোবৃত্তিসমূহ কল্পনা করা হইয়াছে ; যথা—সজীবত্ব, স্বাতন্ত্র্য, মনঃসংযোগ, তত্ত্বানুসন্ধান, উদ্যম, দৃঢ়তা, আনন্দ, ঔদাসীন্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, নির্ব্বুদ্ধিতা, প্রজ্ঞা, ধন লোলু-

পতা, সন্তোষ, ভয়, অবিমৃষ্যকারিতা, লজ্জা, নির্লজ্জতা, ঘৃণা, স্নেহ, সন্দেহ, বিশ্বাস, ভ্রম, শারীরিক বিশ্রাম, মানসিক বিশ্রাম, চপলতা, কর্ম্মতৎপরতা, কোমলত্ব, নমনীয়ত্ব, দক্ষতা, বাক্‌সংযমত্ব, দয়া, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, গর্ব্ব, অহঙ্কার ইত্যাদি।

বৌদ্ধদিগের মতে মনুষ্য পূর্ণতা লাভ করিলে নির্ব্বাণ পাইতে পারে। ভিন্ন ২ ভাষ্যকার মতে নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ ভিন্ন প্রকার প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ নির্ব্বাণকে আত্মার ধ্বংস বলিয়া উল্লেখ করেন এবং কেহ বা মন ও অন্তঃকরণের পাপের অবস্থা হইতে নিষ্পাপ শান্ত বিশুদ্ধ পূর্ণশান্তি ও জ্ঞানের অবস্থা উপস্থিত হওয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তিব্বতবাসিগণের মতে নির্ব্বাণ শব্দের দুঃখের অবস্থা হইতে প্রমুক্ত মন বুঝায়। ক্রোধ, সুরাপান, অবাধ্যতা, গোড়ামী, প্রবঞ্চনা, দ্বেষ, আত্মশ্লাঘা, অন্যকে নিরুৎসাহ করা, অশুচির লক্ষণ। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ৮টী উপদেশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। কোন জীবের প্রাণ নাশ করা উচিত নহে।

২। পরদ্রব্য গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য।

৩। মিথ্যা বলা অনুচিত।

৪। নেশা উদ্দীপক পদার্থ গ্রহণ নিষিদ্ধ।

৫। অবৈধ উপায়ে পর স্ত্রী গমন অনুচিত।

৬। রাত্রিকালে অকালোচিত খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ নিষিদ্ধ।

৭। পুষ্পমাল্য অথবা সুগন্ধি ধারণ নিষিদ্ধ।

৮। মৃত্তিকার উপর মাদুর পাতিয়া শয়ন করা উচিত।

মনের আগ্রহ সহকারে নিম্নলিখিত ৪টী বিষয়ের ধ্যান করা কর্ত্তব্য।

১। শরীরের অপবিত্রতা সম্বন্ধে।

২। ইন্দ্রিয় সম্ভোগ সম্ভূত অপকার সম্বন্ধে।

৩। মানসিক অনুভূতির অচিরস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে।

৪। জীবনের অবস্থাদি সম্বন্ধে।

প্রধান ৪টী বিষয়ে যত্নবান্ হইতে হইবে।

১। মন্দ স্বভাব যেরূপে উদয় হয়, তাহা নিবারণ করা।

২। যে সকল মন্দ প্রকৃতির উদয় হইয়াছে, তাহা দমন করা।

৩। যে উত্তম প্রকৃতির উদয় হয় নাই. তাহা উৎপন্ন করা।

৪। মনে সৎ প্রবৃত্তি না থাকিলে তাহা বৃদ্ধি করা।

সাধুত্বের চারিটী অবস্থা।

১। সাধুত্ব লাভের ইচ্ছা।

২। তদুপযোগী যত্ন ও চেষ্টা।

৩। তদুপযোগী অন্তঃকরণ গঠন।

৪। তত্বানুসন্ধান।

নৈতিক ক্ষমতা পঞ্চবিধ।

বিশ্বাস, বল, স্মৃতি, ধ্যান, বিনা বিচারে কোন বিষয়ের সত্যতা অবিলম্বে উপলব্ধি করার মানসিক ক্ষমতা।

জ্ঞান সপ্তবিধ। বল, স্মৃতি, চিন্তা, ধর্ম্মগ্রন্থের তত্বানুসন্ধান, আনন্দ, বিশ্রাম এবং শান্তি।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনে প্রবেশ করিয়াছিল। গৌতমের উপদেশ শিক্ষার জন্য জনৈক চীনদেশীয় দূত ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা তুর্কিস্থান, কাবুল ও মঙ্গোলিয়ায় বিস্তৃত হইয়াছিল। চীন হইতে ইহা কোরিয়ায় ও কোরিয়া হইতে জাপানে প্রবেশ করিয়াছিল। যে সকল চীন পর্য্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে হিউয়েনথ্ সঙ্গ ও ফাহিয়ান সঙ্গ ছিলেন। কনিকুসের রাজত্ব কালে আফগানিস্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল, ষষ্ঠ শতাব্দীতে নেপালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল। তিব্বতের রাজধানী লাসায় গৌতম বুদ্ধের স্বর্ণ নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে। পুরোহিতগণ লামা নামে অভিহিত। তাহারা প্রধান লামাকে ধর্ম্মোপদেশক বলিয়া নির্ব্বাচন

করে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, কোন না কোন ব্যক্তির মধ্যে বৌদ্ধের আত্মা বাস করে; এবং তাহাকে বিশ্বের প্রধান বলিয়া গণ্য করে ও পূজার উপযুক্ত বলিয়া মনে করে। অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম অতিশয় পবিত্র ছিল। কোন বাহ্যিক আড়ম্বর ও পৌত্তলিকতা ছিল না। অশোক চারিটী গ্রীক্ রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া স্বধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সিংহলের রাজা টিসার নিকট স্বীয়-পুত্র মাহিন্দকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ঘোষ সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে গিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং শ্যাম দেশ বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতাব্দীতে কলিঙ্গ হইতে যাবায় গিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলী ও সুমাত্রা দ্বীপে বিস্তৃত হইয়াছিল। চীন পর্য্যটক হিউয়েন্থ্‌সঙ্ ভারত পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্যের প্ররোচনায় হিন্দুগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম এত দূষিত হইয়াছিল যে, ইহা আর জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিল না এবং যখন ইহা রাজাদের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইল, তখন পুরোহিতদিগের বাধার বিরুদ্ধে ইহা দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইল না। দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন মুসলমানগণ কর্ত্তৃক কাশ্মীর বিজিত হইয়াছিল, তখন অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত ভারতবর্ষে আর বৌদ্ধ ছিল না।

বুদ্ধদেবের সময় যেরূপ বিশুদ্ধ নীতি প্রচলিত ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। নানা স্থানে নানা ভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে। তিব্বতীয়দের বিশ্বাস তাহাদের ধর্ম্ম-পুরোহিত লামার মৃত্যু নাই। তবে তিনি দেহান্তরে প্রবেশ করেন মাত্র। তিব্বত দেশে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে, লামা কখনও বিবাহ করিতে পারেন না।

অপর পুস্তকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে, বৌদ্ধেরা অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করে। ইহাদের মতে পরলোক নাই, ইহলোকেই যে কিছু সুখ দুঃখ হয়, তদ্ব্যতীত জীবাত্মাকে কোন কষ্ট করিতে হয় না। ইহাদের মধ্যে বহুতর মতভেদ আছে। কোন কোন মতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কোন কোন মতে বলে যদিও পরমেশ্বর থাকেন, তাহার আরাধনা করার কোন ফল নাই। কোন কোন মতে কতিপয় মহাপুরুষকে ঈশ্বর

বোধে আরাধনা করে। এই সকল মহাপুরুষেরা লামা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র দয়ারত্ন, বৃহস্পতি সূত্র, অঙ্গচরিত্র ইত্যাদি। বৌদ্ধ দিগের মতে যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড নিষ্ফল। বুদ্ধ কহেন, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ মনুষ্যের দুঃখের কারণ। সমাধি বলে এই সকল রিপু নির্ম্মূল করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধদেব সমুদয় শ্রেণীর লোককে আপনার মতে দীক্ষিত করিতেন। বুদ্ধের মত তাহার শিষ্যগণের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় ৫০০ শিষ্য তাঁহার মৌখিক উপদেশ সমূহ গ্রন্থবদ্ধ করিবার নিমিত্ত রাজগৃহের নিকট সমবেত হয়েন। শিষ্যগণ বুদ্ধের সমুদয় উপদেশ ও মত আবৃত্তি করিয়া ৩টী প্রধান অংশে বিভক্ত করেন। এই ৩ অংশের বিষয় ধর্ম্ম গ্রন্থের ৩ ভাগে বিবৃত হয়। বৌদ্ধদিগের এই সভা 'সঙ্গতি' নামে প্রসিদ্ধ। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ মানবলীলা সংবরণ করেন। বৌদ্ধদিগের মতে জীবাত্মাকে কষ্ট দেওয়াই পাপ। বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে, বহুকাল সংক্রিয়া ধ্যান ধারণ ও সমাধি অবলম্বন করিলে, মনুষ্য ক্রমশঃ এরূপ জ্ঞানাপন্ন হয় যে, অবশেষে কিছুই তাহার অবিদিত থাকে না ও সে স্বয়ং ঐশ্বরিক শক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহাদের নাম বহুজ্ঞান লাভ করন বা বৌদ্ধ হওন। বুদ্ধের মতে সংসার দুঃখময়। দুঃখের কারণ মানুষের সংসারে অনুরাগ। এই অনুরাগ নিবৃত্তি হইয়া বিরাগ উৎপন্ন হইলে দুঃখের অবসান হয়। বিরাগের উৎপাদনের উপায়াবলম্বন কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করা।

জৈন ধর্ম্ম।

নিগ্রন্থনাথ মহাবীর জৈন ধর্ম্ম প্রচার করেন। বৈশালির নিকটস্থ একটী পল্লীতে মহাবীরের জন্ম হয়। মহাবীরের পিতার নাম সিদ্ধার্থ। যৌবনাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হইলে মহাবীর সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। জৈন ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় প্রাচীন। জৈন ভিক্ষুকগণ অহিংসা, সুনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই পঞ্চব্রত পালন করিয়া থাকেন। জৈনেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাহার মহিমা স্বীকার করে না। কেবল বস্তুর নিত্যতা স্বীকার করে। ইহাদের মতে অহিংসা

পরম ধর্ম্ম। জৈনদিগের মধ্যে যাহারা সাধু, তাহারা ভিক্ষালব্ধ অন্ন মাত্র আহার, শুক্ল বস্ত্র পরিধান ও লুঞ্চিত কেশ ধারণ করিয়া থাকে। তাহারা নিঃশব্দ ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল; জৈনবর্ষীরা বস্ত্র পরিধান করে না। লুঞ্চিত বেণী রাখেন ও হস্তে পিচ্ছিলিকা ধারণ করিয়া থাকেন। যখন কোন স্থানে যাইবার আবশ্যক হয়, তখন জীবহত্যা ভয়ে হস্তস্থিত পিচ্ছিলিকা দ্বারা অগ্রে পথ হইতে পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী সকল অপসারিত করিয়া পশ্চাৎ পদ প্রক্ষেপ করেন। ইহারা জল পাত্র ব্যবহার করে না। হস্ত দ্বারাই জলপান করিয়া থাকেন। কখনও একাকী আহার করে না। ইহারা স্ত্রী সহবাস-সুখে একান্ত বিরত। অধুনা রাজপুতনা, কানাড়া ও গুজরাট প্রদেশে জৈন দৃষ্ট হয়। অর্হিতদিগের মধ্যে যে সম্প্রদায় আছে, তাহা-দিগকেই জৈন বলে।

নানক পন্থী।

নানক শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ১৪৬৯ খৃঃ অব্দে লাহোরের ১০ মাইল দক্ষিণে কানাকুচা গ্রামে নানকের জন্ম হয়। নানকের পিতার নাম কালুদেব। কালুদেব ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। নানক অল্প বয়সে লিখা পড়া শিখিয়া শুদ্ধাচারী ও চিন্তাশীল হয়েন। ক্রমে সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার বিরাগ জন্মে। তিনি সন্ন্যাসীর বেশে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করেন। নানক আরবের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া * মক্কা যাইতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এই সকল স্থানের সাধু যোগী ফকিরদিগের কার্য্য কলাপ দেখিয়া নানক স্বদেশে গিয়া গুরুদাসপুর জেলার ইরাবতী তটে কীর্ত্তিপুর গ্রামে একটী ধর্ম্মশালা স্থাপন পূর্ব্বক তথায় বাস করেন। এখানে ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে ৭১ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মতে বিশুদ্ধ হৃদয় অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই ধর্ম্ম প্রচার করা হয়। নানকের শিষ্যগণ শিখ নামে প্রসিদ্ধ। নানক বহুবিধ পুস্তক হইতে স্বীয় মতানুসারে সার সংগ্রহ করিয়া এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহাদের মতে আত্মা অবিনশ্বর এবং পুণ্য-

* নানকের মক্কা যাওয়া কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না।

বলে লোক অনন্ত সুখধামে উপস্থিত হইতে পারে। শিখেরা গোহত্যাকে অতিশয় পাপজনক মনে করে। কিন্তু গোমাংস ভিন্ন সকল প্রকার মাংসই ইহাদেরই খাদ্য। শিখদিগের মতে জাতিভেদ নাই। শিখেরা তামাক খাওয়াকে পাপ মনে করে। কিন্তু সুরাপান দোষণীয় মনে করে না। আদি গ্রন্থ শিখদিগের প্রধান ধর্ম্মপুস্তক। গুরুগোবিন্দ ইহা রচনা করেন। অমৃতসরের শিখেরা একত্র হইয়া গীতি পাঠ করেন ও স্বজাতীয় ধর্ম্মীষ্ঠদিগের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করিয়া থাকেন। ইহাই তাহাদের ধর্ম্মকার্য্য মধ্যে পরিগণিত। এই স্বর্ণমন্দির দেখিবার জিনিস বটে।

জড়োপাসনা।

মুসলমান, হিন্দু, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ৫ প্রকার ধর্ম্ম ব্যতীত পৃথিবীতে আরও অনেক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে ও ছিল। তন্মধ্যে কোন কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এতই মূর্খ ও অজ্ঞান যে, সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহে। বৃক্ষ, বায়ু, জল প্রভৃতি যে কোন পদার্থের কোন বিশেষ ক্ষমতা দেখে, তাহাকেই ঈশ্বর জ্ঞানে অর্চ্চনা করে। তাহারা দেখিতে পায়, অগ্নি নিমেষ মধ্যে গৃহাদি দগ্ধ করিয়া ফেলে। প্রবল বায়ু উপস্থিত হইলে ঘোর প্রলয় উপস্থিত হয়। মেঘ ভীমনাদে গর্জ্জন করে এবং তাহা হইতে অগ্নি শিখা নিঃসৃত হয়। এই সকল ব্যাপার কি নিমিত্ত ঘটে, তাহারা ভাবিয়া কুল পায়না। সুতরাং এই সকল জড় পদার্থকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন জ্ঞান করিয়া দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকে। এই প্রকার লোকদিগকে জড়োপাসক ও ইহাদের ধর্ম্মকে জড়োপাসনা বলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মীমাংসা।

পৃথিবীতে নানাপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। কোন্ ধর্ম্ম সত্য, কোন্ ধর্ম্ম মিথ্যা, যুক্তি দ্বারা তাহার নিরাকরণ করা সাধ্যাতীত। সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মের সারবত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন। পরলোকের বিষয় গভীর অন্ধকারময়। কেহই পরলোক হইতে প্রত্যাগত হয় নাই। সুতরাং তৎ সম্বন্ধীয় গূঢ় তত্ত্ব জানা মহা কষ্টকর। তাই বলিয়া যে ধর্ম্ম বন্ধন কিছুই নয়, এমত বলা যাইতে পারে না। অবশ্য অবশ্য আছে। তবে সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে এবং ন্যায় অন্যায়ের পুরস্কার তিরস্কার আছে। আমাদিগকে সৃজন করার অবশ্য গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। তিনি যে আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোল্লিখিত পথগুলি অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, নানকপন্থী, জৈন ও পারসী ধর্ম্মগুলিতে অসম্পূর্ণ কথা আছে কিনা, তাহা বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ রাজধর্ম্ম খৃষ্টান শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, তাহাতে ঈশ্বরের গুণ ও সকলের মধ্যে তাহার প্রতি দোষারোপ হয় কি না? খৃষ্টানগণ বলেন, যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। যদি তিনি ঈশ্বরের পুত্র হইতেন, তবে পাইলেট রাজা কেন তাঁহাকে ক্রুশে হস্ত বিদ্ধ করিলেন। বাইবেলে লিখিত আছে, পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা এই তিন জন ঈশ্বর। কিন্তু যুক্তিমার্গে বিচরণ করিতে গেলে ঈশ্বর এক বৈ তিন হইতে পারে না। তিন হইলে তাঁহার একাধিপত্য কোথায় রহিল? আধিপত্য বিভক্ত হইয়া যায়। যদি খৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র হইতেন, তবে তিনি কেন ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন! আর বাইবেলে লিখিত আছে, আমালেক নামে এক জাতি পাপী হওয়াতে ঈশ্বর সেই জাতির সর্ব্বস্ব বিনষ্ট করিতে ও তাহাদের স্ত্রী পুত্র ও স্তন্যপায়ী শিশু, গরু, মেষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ সকলকে বধ করিতে শৌল রাজাকে আজ্ঞা দিলেন। ইহাতে ঈশ্বরের প্রতি দোষা-

রোপ ও নির্দ্দয় কার্য্য ঘোষণা করা হইল। সুতরাং এ কথা যে অমূলক তাহার আর সন্দেহ কি? আরও লিখিত আছে, ঈশ্বর যাকুবের সহিত প্রভাত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও পরাস্ত হইলেন। ইহা কি ঈশ্বরের নামে গভীর কলঙ্কারোপ নহে? সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কেন মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন ও কেন পরাস্ত হইবেন? এতদ্ব্যতীত বিবাহ করা, সন্তান উৎপাদন করা, ইন্দ্রিয় পরবশ মনুষ্যের কার্য্য; কথনই ঈশ্বরের কার্য্য নহে। আরও লিখিত আছে, পিতার কার্য্য পৃথিবী সৃষ্টি ও পালন করা, পুত্রের কার্য্য পাপীদিগকে উদ্ধার করা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেওয়া; পবিত্রাত্মার কার্য্য মনুষ্যের অন্তঃকরণ নির্ম্মল করা। বাস্তবিক পবিত্রাত্মা ঈশ্বরের দাস, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারেন। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তৃতীয়তঃ ঈশ্বরের পবিত্রাত্মা কখন কপোত, কখনও বা গৰ্দ্দভাকৃতি কখনও বা স্বর্গ দূতের আকৃতি ধারণ করিতেন। * কিন্তু ঈশ্বর চিরস্থায়ী নিত্য বস্তু, কখনও তাহার বিকার হইতে পারে না। মনুষ্যত্ব নূতন অর্থাৎ তাহার বিকার হইতে পারে, কিন্তু চিরস্থায়ী নিত্য বস্তু ঈশ্বরের নূতন রূপ ধারণ সম্ভবপর নহে। সুতরাং ঐ সকল সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ। কোন হিন্দু কবি এক সময় বলিয়াছিলেন,—

"জগদীশ হয় যদি মেরীর তনয়। ঘোষের তনয় তবে দোষের ত নয়॥
ত্রাণকর্ত্তা হয় যদি মেরী মায়ের যাদু। কি দোষ করিল মোর যশোদার যাদু॥"

আবার পৌত্তলিক হিন্দুদিগের সম্বন্ধে বিচার করুন। তাহারা বলেন, ঈশ্বর কি প্রকার তাহা আমরা জানি না। মনের সাধু প্রবৃত্তির উন্নতির জন্য উপাসনা করা আবশ্যক। অতএব একটী কাল্পনিক মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া উপাসনা করিলে সাধকের সাহায্য হইতে পারে। কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া সত্য ভাবের উদয় হওয়া কি ঘৃণিত স্থূলদর্শী লোকের কথা। নিজ হস্তে বিচিত্রিত একটী সুন্দরীর সহিত প্রণয়ে আসক্ত হইতে যদি পার, দাবা খেলাতে অশ্বারোহী বলিয়া যদি গৌরব করিতে পার, তবে একটী মূর্ত্তিকে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া উপাসনা করিলে ফল লাভ হইবে। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী

* এক্ষেত্রে ঈশ্বরের অবতার বাদ স্বীকারকারী হিন্দুদিগের সহিত খ্রীষ্টানদিগের কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

নির্ব্বিকার চৈতন্য স্বরূপ, এটী ধ্রুব সত্য; কিন্তু হিন্দু যখন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল, তখন ঈশ্বরের নিরাকার গুণ কোথায় রহিল? হিন্দুরা বলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন অংশে ঈশ্বর মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশিত আছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি গুণের আধার, তিনি সৃষ্টি করেন। বিষ্ণু স্থিতি গুণের আধার, তিনি পালন করেন। শিব লয় গুণের আধার, তিনি সংহার করেন। তাঁহারা আরও বলেন, এই তিনই এক এবং একই তিন এবং ঈশ্বর ৩ অংশে পৃথক্ হইয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন নামে খ্যাত হন। ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং নিরাকার ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজিত। কিন্তু ইহাদের কথায় দেখা যায়, ঈশ্বর ৩ অংশে বিভক্ত ও আকার বিশিষ্ট—সুতরাং বিশেষ কোন স্থানে বিরাজিত। কি ভ্রান্তি! সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই ত্রিবিধ গুণের একে অন্যকে ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারে না। যে স্থানে সৃষ্টি গুণ, সেই স্থানে সৃষ্টি ও লয় গুণ জড়িত; যে স্থানে লয় গুণ, সেই স্থানে সৃষ্টি ও স্থিতি গুণ জড়িত থাকে। দেখুন! আমরা যখন কোনও প্রদীপে তৈল দিয়া বাতি জ্বালাইয়া দেই, তখন তাহার স্থায়ী কাল ও নির্ব্বাণ কাল অবশ্যই নির্দ্দেশ করিতে পারি। যতক্ষণ তৈল ও বাতির অভাব না হয়, ততক্ষণ প্রদীপটী জ্বলিতে থাকে। যেই মাত্র তৈল বাতি ফুরায়, অমনি সহজে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। তাহাকে রক্ষা করিবার ও নির্ব্বাণ করিবার জন্য অন্যের আবশ্যক করে না। আর যখন সেই প্রদীপ জ্বলিতে থাকে, তখন যত পূর্ব্বে তাহার সৃষ্টি হউক না কেন, জ্বলনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তাহার জ্বলিবার শক্তি উদ্ভব হইতে থাকে এবং যত বাকী থাকুক না কেন, তৈল বাতি ফুরাইয়া নির্ব্বাণ হইবার একটী সময়ও নির্দ্দিষ্ট থাকে। আবার যখন নির্ব্বাণ হয়, তখন তাহার লয় গুণের সহিত এক কালে সৃষ্টি স্থিতি উভয় গুণ লয় হইয়া যায়। এই উদাহরণের দ্বারা দেখা যায় যে, সৃষ্টি স্থিতি লয় গুণ ইহারা কখনই একে অন্যকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। যাহার আকার আছে, তাহার সীমাও আছে এবং সে বিশেষ আকারের স্থান মাত্র অবরোধ করিয়া থাকে। তাহা হইলে তাহার আকারের বহির্ভূত স্থান শূন্য অর্থাৎ তাহাকে ছাড়া থাকে। পাঠক মহাশয় এখন বিচার করিয়া দেখুন, হিন্দুরা পরমেশ্বরের যে লক্ষণ ব্যাখ্যা ও বিশ্বাস করেন এবং আদি বাড়ী বলিয়া যাহা স্বীকার করেন, তাহা কি যুক্তি

সঙ্গত? কখনই না। পরমেশ্বর একাধিক হইতে পারেন না। যাহা কিছু আকার বিশিষ্ট, তাহাতেই শক্তি ও পরমাণু আছে এবং তাহাই পরমেশ্বরের সৃষ্ট। নিত্য পরিদর্শন সকল বিজ্ঞানের বীজ। জীবনের নিত্য পরিদর্শনে আমরা দেখিতে পাই, ফুল ফুটিল; কিছুকাল পরে তাহা শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকায় পড়িল। পরে একটী ফল উৎপন্ন হইল, এখানে দেখা গেল, যিনি ফুলের স্রষ্টা, তিনিই আবার ধ্বংসের নিদান এবং স্থিতির নিয়ামক। সুতরাং এখানে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্যত্রয়ের একমাত্র কারণ পরিলক্ষিত হইল। সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন মূর্ত্তিতে ঈশ্বর মূর্ত্তিমান ৩ অংশে প্রকাশ হওয়া অযৌক্তিক।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তিনি সর্ব্ব শক্তিমান, তিনি নিরাকার; যদি তাঁহার আকার কল্পনা করা যায়, তবে তাহাও সর্ব্বব্যাপী হইবে। তবে জগৎ কোথায় থাকিবে। ঈশ্বরের শরীর দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু যখন জগৎ দেখি, তখন ঈশ্বর শরীরধারী নহেন বোধ হয়। দেবতারা মনুষ্য ছিলেন। পুরাণে লিখিত আছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। ইহারা জন্ম মৃত্যুর অধীন ছিলেন। ইঁহাদের পিতার নাম কশুপ, মাতার নাম অদিতি। আর্য্য জাতির মধ্যে জ্ঞানী লোককে দেবতা এবং অধার্ম্মিককে অসুর বলিত। মনুষ্য কখন মনুষ্যকে মুক্তি দিতে পারে না। তাহাদের আরাধনায় কোন ফল নাই। আর্য্য জাতিগণ অগ্নি, সূর্য্য, নক্ষত্র, মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্র, এই সমুদয়কে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। জ্ঞানের উন্নতি হইলে যখন জানিলেন, তাহারা সৃষ্ট পদার্থ, তখন ইহাদের পূজা পরিত্যাগ করিলেন। উপনিষদের একটী শ্লোকের মর্ম্ম এই, যে ব্যক্তি এই অবিনাশী ঈশ্বরকে না জনিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ইহলোকে হোম, জাগ, তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী সুখ পায় না। হিন্দু ধর্ম্মে ঈশ্বরের অবতারের বিষয় লিখিত আছে। প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া অপর রূপ প্রদর্শন করাকে ছদ্মবেশ কহে। তবে কি ঈশ্বর ছদ্মবেশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিম্বা তিনি কি বহুরূপী, তিনি কি ছদ্মবেশধারী কপটাচারী? ঈশ্বরকে ছদ্মবেশী কপটাচারী বলিলে গালি দেওয়া হয়। ঐ সকল অবতার পৃথিবীতে আসিয়া কপটাচার করিয়া গিয়াছেন বলিলে, নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা মনুষ্য ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা ঈশ্বর ছিলেন না। বেদ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর

জাতি অর্থাৎ শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়েরা অধ্যয়ন করিলে নরকস্থ হইবে, ইহা কি যুক্তি সঙ্গত কথা? এক জাতি অন্য জাতির অন্ন ভক্ষণ করিবে না, অথচ সকলেই এক হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। ইহা কি ঈশ্বরের অনুমোদিত? সুতরাং ইহাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পরমেশ্বর মনুষ্য মাত্রকেই সৃজন করিয়াছেন। তিনি সকলের উপাস্য, তিনি জাতি ভেদ করেন নাই। মনুষ্য মনুষ্যকে হীন অপবিত্র মনে করিলে অপরাধী হয়। সকল মনুষ্য সমান। মনুষ্য মাত্রেই এক জাতি। কেবল স্ত্রী, পুরুষ এইমাত্র বিভিন্ন। জাতির মান্য না করিয়া গুণের মান্য করা উচিত। বৌদ্ধ এবং নানক পন্থীর বিষয় বলাও নিষ্প্রয়োজন। বৌদ্ধ, নানক পন্থী ও জৈন—হিন্দু ধর্ম্মের এক শাখা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে পারসিকদিগের ধর্ম্মকে জড়োপাসনার অপরাঙ্গ বলা যাইতে পারে।

পাঠক মহাশয়গণ, জড়োপাসকদিগের বিষয় বলিয়া লাভ কি? তাহাদের সকলেরই দশা হিন্দুদিগের ন্যায় হইবে সন্দেহ নাই। কারণ তদ্দারা সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন কোন পদার্থ বিশেষকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, তাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ জগতে যত ধর্ম্ম আছে, সমুদয় ধর্ম্মের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এক ধর্ম্ম বিপথগামী এবং এক ধর্ম্ম সুপথগামী। যাহারা নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করে, তাহারাই সুপথগামী। আর যাহারা সাকার প্রাণীর ও চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র অগ্নি ইত্যাদি সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা করে, তাহারাই বিপথগামী। বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে গেলে, বেশ প্রতীতি হয় যে, এই জগতে একমাত্র মুসলমান জাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতিই সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ও নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করে না। ফলতঃ একেশ্বরবাদ ঘোষণা কোন ধর্ম্মে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।. পাঠক এখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করুন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রাজা রামমোহন রায়ের এক প্রকার কল্পনা প্রসূত। ইস্‌লাম ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কোন কোন বিষয়ে একতা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কোন তুলনাই হয় না। বিবেকের উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত। তাহারা কোন পথ প্রদর্শকের মধ্যবর্ত্তিতা কি কোন ধর্ম্ম গ্রন্থের অধীনতা স্বীকার করেন না। এই ধর্ম্মের প্রতিবাদে এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, সকল মনুষ্যের বিবেক সমান নহে।

বিশেষতঃ একমাত্র মনুষ্যের বিবেকের উপর অতি দুরূহ ধর্ম্ম কার্য্যের ভার ন্যস্ত করা কখনও সম্ভবপর নহে। মনুষ্যের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ ও স্বার্থপর তন্ত্র; সুতরাং ইহার মতানুসরণ করিলে যে পরলোকে শান্তি লাভ হইবে, এরূপ আশা নাই। মনুষ্যের বিবেক ও জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপ্রদ। মনুষ্যের অন্তঃকরণে বিবেক রূপ কল্পনা, আশঙ্কা বা সন্দেহ, এই দুইটি বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ আছে। এই দুইটির সকল সময়ে ঐক্য নাই। সুতরাং ইহাদের মধ্যে অনেকবার প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়। তাহাতে কখন বিবেক, কখন কল্পনা জয় লাভ করে। মনুষ্যের শারীরিক অবস্থা পরিবর্ত্তন নিবন্ধন যেমন সুস্থ অসুস্থ হর্ষিত বিষাদিত হইতে হয়, তেমন মনুষ্যের বিবেক শক্তির ও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হয়। আবার বৃদ্ধ ও যুবকের একরূপ নয়। বিশেষতঃ সকল মনুষ্যের বিবেক বিভিন্ন। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে সর্ব্বদা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। বিবেকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত বিষয়ের নিরাকরণে অক্ষম। যেমন পরলোকের অবস্থা, আত্মা ও খোদাতাআলা কি পদার্থ ইত্যাদি। অতএব সুধু যাহারা বিবেকের উপর নির্ভর করেন, কিন্তু পরমেশ্বরের বিশেষ শক্তির আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তাহাদের মত নিতান্ত অসার এবং অযৌক্তিক। বিবেক যদি সম্পূর্ণ ও নির্ভুল হইত, তবে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ থাকিত না। যেমন কোন পণ্ডিত বলেন, পৃথিবী কখনও ধ্বংস হইবে না, যে ভাবে আছে, সেই ভাবেই থাকিবে। পক্ষান্তরে কোন পণ্ডিত বলেন, বিশ্ব জগৎ ধ্বংস হইবে; কেন না জগতের যাবতীয় পদার্থই নশ্বর। যেহেতু আমরা নিত্য দেখিতেছি, এক বস্তুর এই জন্ম হইল, কিছুকাল জীবিত থাকিয়া আবার ধ্বংস হইতেছে; পৃথিবীও সেইরূপ হইবে। বস্তুতঃ পার্থিব কার্য্যের উন্নতি জন্য বিবেক ফলদায়ক; কিন্তু পারলৌকিক উন্নতির জন্য বিবেক ফলদায়ক বলিয়া প্রমাণিত হয় না; যথা কোন নির্জ্জন স্থানে একটী মৃতদেহ থাকিলে অনেকের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয়; এস্থলে আশঙ্কা বা কল্পনার ক্রিয়াই অধিকতর কার্য্যকরী হইয়া থাকে। বিবেক বলিতেছে, যাহার জীবন নাই, তাহার নিকট ভয়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। অন্যান্য অচেতন পদার্থ যেরূপ শক্তিহীন ও কার্য্যাক্ষম, মৃতদেহও অবিকল সেইরূপ। কিন্তু অনেক স্থলেই কল্পনার শক্তি প্রবল হইয়া বিবেককে পরাভূত করে—অর্থাৎ অনেকেই মৃতদেহ দেখিয়া

ভীত হইয়া থাকে। কাজেই এখানে বিবেক কার্য্যকরী হয় না। বিবেক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আপনার কার্য্য সম্পন্ন করে। যাহা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বহির্ভূত, সেরূপ বিষয় অবগত হইতে হইলে জ্ঞান ও অনুমানের দ্বারা একটী সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সুতরাং এরূপ স্থলে অনেকের ভ্রমই হইয়া থাকে। স্থূল কথা এই যে, যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বহির্ভূত, তাহা জানিতে যাইয়া বিবেক ও অনেক সময়ে বিপদে পড়ে। পরমেশ্বর কি বস্তু, তাঁহার কি গুণ, আর পরকালে কি হইবে, এ সকল বিষয় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বহির্ভূত। ইন্দ্রিয়ের যে স্থলে অনধিকার, বিবেক সে স্থলে নিরুপায় এবং নিরবলম্বন। এখন ইস্লাম ধর্ম্মের কথা শুনুন। ইস্লাম ধর্ম্মে নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদর্শী অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের আরাধনার কথা লিখিত আছে, ঈশ্বর ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত দাস। ইহারা সম্পূর্ণ পৌত্তলিক বিরোধী। ঈশ্বর একাধারে জীবন দাতা, রক্ষাকর্ত্তা, সংহার কর্ত্তা; ঈশ্বর হইতে কেহই জন্ম গ্রহণ করেনা এবং তিনি কাহাকে জন্ম দেন নাই। তিনি আহার করেন না, তাঁহার সমকক্ষ ও অংশী, আত্মীয় ও কুটম্ব কেহই নাই; তাঁহার অবতার নাই। তাঁহার কাম ভাব নাই; সাধারণতঃ ইহাই ইসলাম-ধর্ম্মের মোটামুটি ধর্ম্ম বিশ্বাস। এ ধর্ম্মে জাতি ভেদ নাই। সকলকে স্বধর্ম্মে আহ্বান করিয়াছে। জাতিগত পৌরহিত্বপদ নাই এবং গুরুর জন্য কোন শাস্ত্রিক ক্রিয়া আবদ্ধ নাই। যে শাস্ত্রদর্শী, সেই পুরোহিত ও গৌরবান্বিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(কোরাণের সত্যতা)

কোরান শরিফ ঈশ্বর প্রদত্ত গ্রন্থ নয় বলিয়া বিধর্ম্মীরা যে সন্দেহ করিয়া থাকেন, ক্রমান্বয়ে তাহার সত্যতার প্রমাণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

১। ইহার প্রচলন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কেহই ইহার লেখকের নাম বলিতে পারে নাই। ২। গ্রন্থকার মাত্রেই স্বরচিত গ্রন্থে নাম প্রকাশিত করিয়া বিদ্বান্ সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে চাহেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা; যদি কোরান শরিফ মনুষ্য কৃত হইত, তবে অবশ্যই গ্রন্থকারের নাম প্রদত্ত হইত। ৩। মনুষ্য কৃত গ্রন্থ কখনই নিরপেক্ষ হয় না। স্বার্থপরতায় জড়িত থাকে। কিন্তু এই পবিত্র গ্রন্থ স্বার্থপরতা কি অন্যবিধ বৃথা বাগাড়ম্বর দোষ বিবর্জ্জিত। ৪। ইহার ভাষা এত বিশুদ্ধ এবং শ্রুতি মধুর যে, কেহই এ পর্য্যন্ত ইহার মত একটী শব্দ লিখিতে সক্ষম হয়েন নাই। শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ যে সময়ে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন সমগ্র আরব দেশে পৌত্তলিক-ধর্ম্ম বিরাজমান এবং সকলেই হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ঘোর শত্রু ছিল। পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহার নিন্দা সূচক কবিতা রচনা করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতেন। সুতরাং ইহাও সম্ভবপর নহে যে, হজরত কোন বিধর্ম্মী পণ্ডিতের সাহায্যে এই মহাগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন। তিনি ধর্ম্ম প্রচারের প্রথম দিবস হইতেই এই কোরাণের সাহায্যে প্রচার করিতে ছিলেন। সুতরাং ইহাও কেহ বলিতে পারিবেন না যে, তাঁহার শিষ্য পণ্ডিতগণ পরে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ৫। কোরাণ শরিফ চির হিতকর ও অকপট উপদেশ পূর্ণ ও অশ্লীলতা দোষ বিরহিত। ৬। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক লিখা পড়া জানিতেন না, একজন নিরক্ষর (উম্মি) লোকের দ্বারা এরূপ অদ্ভুত ও বিস্ময়কর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিরচিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং কোরাণ যে ঈশ্বর প্রদত্ত মহাগ্রন্থ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

পরলোকের অস্তিত্ব। (১)

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের মতে পরলোক নাই। কিন্তু মুসলমানেরা পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যাহা হউক, পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কতিপয় প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

পরীক্ষা স্বরূপ ইহলোকে ঈশ্বর মনুষ্য হস্তে ক্ষমতার্পণ করিয়া, ন্যায় অন্যায় এই দুইটী বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং উভয় কার্য্য করা না করার অধিকার (স্বাধীনতা) মানব জাতির প্রতি অর্পণ (২) করিয়াছেন। সুতরাং সেই

(১) প্রতিপক্ষ দিগের যুক্তি এইঃ—পরকাল যে আছে তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না; কেহ সে অবস্থা দেখিয়াছেন এমনও শ্রুত হওয়া যায় না; সুতরাং তাহার স্বত্বা ও নাই। ইহার উত্তর জন ষ্টুয়ার্ট মিল এইরূপ দিয়াছেন যে, যে পদার্থের স্বত্বা বিচার হইতেছে, সেটী যদি এ জগতের পদার্থ বলিয়া বর্ণিত হইত, এবং অদ্যাবধি কোন মনুষ্যই দেখে নাই এরূপ প্রমাণিত হইত, তাহা হইলে সেই বস্তুটী নাই বলিলে অযৌক্তিক হইতনা। যেমন যদি কেহ বলেন, ডুমুরের ফুল আছে। অথচ জগৎ শুদ্ধ লোকে শত শত বৎসর ধরিয়া সকল সময়ে সকল অবস্থায় ডুমুরের বৃক্ষ দেখিতেছে; কিন্তু অদ্যাপি কেহ তাহার ফুল দেখিল না। কারণ সেই বস্তুটী এহ জগতের বস্তু। পরকাল সম্বন্ধে সেরূপ বলিবার সাধ্য নাই, সে অবস্থাটী এ জগতের অবস্থা নয়, সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা নাই। প্রজাপতি প্রথম কীট অবস্থায় থাকে, পরে পতঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কীট হইতে যে সুন্দর পতঙ্গ বাহির হয়, ইহা যিনি কখনও দেখেন নাই, তাহার পক্ষে সেই কীট দেখিয়া সে কীট পতঙ্গ হইবে না এই কথা বলা যেমন, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও সেই প্রকার।

(২) প্রতিপক্ষ দিগের যুক্তি এইঃ—জগতের সকল বস্তুই কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সুন্দর ফুলটী প্রস্ফুটিত হইল, ২।১ দিনের জন্য শোভা বিস্তার করিল, দুই দিন লোকের মন হরণ করিল, পরে আপনা আপনি বিলীন হইয়া গেল। সকল বস্তুই যখন কালে বিলীন হয়, তখন মানবের পক্ষে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? সাদৃশ্যে বিচার করিতে গেলে বরং ইহাই বলা যুক্তি যুক্ত বোধ হয় যে, মানবের শরীর ধ্বংস হইলে আর কিছু থাকিবেনা। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, দশটী স্থানে একটী ঘটনা ঘটে বলিয়া যে একাদশটী স্থলে তাহাই ঘটিবে তাহা কে বলিল? যদি উক্ত উভয় বস্তু স্বজাতীয় বা স্ব ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তাহা হইলেও একদিন এইরূপ অনুমান সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী

ক্ষমতা যথোচিত রূপে চালিত হইয়াছে কিনা, অর্থাৎ ঐহিক সদসৎ পুরস্কার এবং তিরস্কারের ফল (১) প্রদর্শন করণার্থে একটী স্বতন্ত্র স্থানের আবশ্যক।

পদার্থের প্রতি সাদৃশ মূলক যুক্তি সম্পূর্ণ রূপে খাটেনা। মনে করুন, এক ব্যক্তি অদ্যাবধি যত তরু দেখিয়াছেন, সকল স্থানেই দেখিতে পাইয়াছেন, এক ফল পাকিয়া গেলে আবার ফল জন্মে; তিনি যদি একটী কদলি-বৃক্ষ বা ধান্য বৃক্ষ দেখিয়া বলেন যে, ইহাতে যে ফল ধরিয়াছে, তাহা পাকিয়া গেলে আবার ফল ধরিবে; তখন কি আমরা তাহাকে এই কথা বলিনা যে, তুমি ২০০ শত স্থানে এক ফল পাকিতে, আর এক ফল ধরিতে দেখিয়াছ; তথাপি এই সকল তরু সে শ্রেণীভুক্ত নয়। ইহাদের একবার ফল পাকিলে আর সে বৃক্ষে ফল ধরেনা। সেইরূপ পুষ্পাদির উল্লেখ করিয়া যিনি সাদৃশ বিচার করেন, তাহাকে কি এই কথা বলা যায়না যে, তুমি যাহা বলিতেছ, পুষ্পাদির পক্ষে তাহা নিয়ম, মানবাত্মার পক্ষে সে নিয়ম নয়।

(১) প্রকৃতির মূলে গেলেই দেখিতে পাইবে যে, জীবন তৃষ্ণার মধ্যে দুই প্রকার ভাব আছে। প্রথমতঃ বর্ত্তমান জীবনের প্রতি অনুরাগ বা শ্রদ্ধার অভাব এবং ভাবী জীবনের জন্য আশা ও বাসনা। এমন লোক প্রায় দৃষ্ট হয় না, যে আপনার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট। তোমার হৃদয় মনের অবস্থা যেরূপ রহিয়াছে, তোমার সুখ দুঃখের পরিমাণ ও সেরূপ রহি-য়াছে। তোমার এখানকার জীবন যাহা—তাহাতে তোমার চিত্তের সন্তোষ আছে কিনা, এই প্রশ্ন করিলেই সকলে বলিবেন, না, তবে বাঁচিয়া থাকি-বার ইচ্ছা কর কেন? তবে জীবনকে প্রার্থনীয় জ্ঞান কর কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বলিবেন, বর্ত্তমান জীবনের জন্য জীবনকে প্রার্থনীয় জ্ঞান-করিনা। কিন্তু ভবিষ্যতের আশাতেই তাহাকে প্রার্থনীয় মনে করি। এখানে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের যে জীবন-তৃষ্ণা আছে, তাহার মূলে উক্ত উভয় ভাব আছে। সুতরাং জগতে যে জীবন যাপন করি, তদ্দ্বারা সে তৃষ্ণার নিবারণ হইতেছেনা; তাহার নিবৃত্তির নিমিত্ত অবচ্ছিন্ন জীবন ধারণের প্রয়োজন।

পরকালে বিশ্বাস স্থাপনের অন্যতর কারণ এই যে, মানবের মনে নিজ আত্মার সুখ বিকাশ ও উন্নতির একটী আদর্শ আছে। যে আদর্শ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত থাকাতেই আমাদের বর্ত্তমান জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়না। আমরা কি চাই, এ জ্ঞান না থাকিলে ইহা চাইনা একথা বলা সম্ভব নয়। মানবের জীবন উন্নতি ও মহত্ব বিষয়ে আমাদের যে আদর্শ আছে, পরকাল না থাকিলে সে আদর্শ পূর্ণ হয় না। যদি একটী কাগজে কোন একটী অক্ষর লিখিয়া তাহার অর্দ্ধেক এমতভাবে ছিন্ন করা যায় যে, উক্ত

অতএব পরলোকের সৃজন করিয়াছেন, * এবং তাহার আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। পরলোক চিরস্থায়ী এবং তথাকার অধিবাসীরা অমর। ২য়তঃ এই সংসারে কি বড়, কি ছোট সকলের জীবনই অশান্তিময়। আজ কাহারও আর্থিক চিন্তা, কাল হয়ত কাহারও আত্মীয় জনের মৃত্যু জনিত শোক, আবার পরশ্ব হয় ত কেহ পীড়িত, ফলতঃ কেহই সুখী নহে। তৃতীয়তঃ আরও দেখা যায়, অনেক সাধু লোক নিরর্থক যন্ত্রণা ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আবার অনেক অধার্ম্মিক পরম সুখে কালযাপন করিতেছে। অতএব ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীতি হইতেছে যে, পরিতৃপ্তি হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র স্থান রহিয়াছে; সেই স্বতন্ত্র স্থানই পরলোক। পরলোক না থাকিলে কাহারও মৃত্যু হইত না। সমুদয় ধর্ম্মেই ন্যূনাধিক পরলোকের অস্তিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।

অক্ষরটীর অর্দ্ধেক একখণ্ডে এবং অপরার্দ্ধ অপর খণ্ডে থাকে, তৎপর যদি তাহার একখণ্ড কাগজ কাহাকেও দেখান যায়, সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিবে, ইহার আর একখণ্ড আছে। কারণ তদ্ভিন্ন অক্ষরটী পূর্ণ হয় না। এখানে দেখা যাইতেছে যে, পূর্ণ অক্ষরটীর ভাব মনে থাকাতেই আর এক খণ্ডের চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইতেছে। সেইরূপ মানব জীবনের পূর্ণতার একটী আদর্শ মনে থাকাতে, পরকালের চিন্তা আপনা আপনি মনে হয়। মৃত বাবু কেশবচন্দ্র সেন কাগজের এই দৃষ্টান্তটী এক সময় প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

* পরমেশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা না দিলে, মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্ম অসম্ভব হইত। ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে ইহাই মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ গৌরব। স্বাধীনতাই ধর্ম্মের জীবন। যে নারী চিরকাল লৌহময় গৃহে কঠিন নিগড়ে বদ্ধ, তাহাকে সতী বলিয়া কি কেহ প্রশংসা করিতে পারে? যেখানে পাপ করিবার ক্ষমতা নাই, সেখানে ধর্ম্মোপার্জ্জনও অসম্ভব। পক্ষাঘাত রোগে যাহার হস্ত পদ অবশ, তাহাকে কি কেহ কখন নিরুপদ্রবকারী বলিয়া—কাহাকে আঘাত করেন না বলিয়া প্রশংসা করিতে পারে? স্বাধীনতা আছে বলিয়াই মানুষের গৌরব, যদি স্বাধীনতা না থাকিত, তবে মনুষ্য কোন সৎকার্য্য করিলেও মানুষের কার্য্য বলিয়া তাহার কোন মূল্য থাকিত না। বিপরীত পথে চলিবার শক্তি আছে বলিয়াই মানুষ সৎপথে চলিলে তাহার প্রশংসা ও গৌরব। গ্রহের কক্ষের ন্যায় যদি মানব জীবনের একই নির্দ্দিষ্ট পথ থাকিত ও উহা হইতে বিচ্যুত হওয়া ঐশিক নিয়মানুসারে অসম্ভব হইত, তাহা হইলে মানবের কার্য্যে নিন্দা বা প্রশংসা, দোষ বা গুণ গৌরব বা হীনতা, ধর্ম্ম বা অধর্ম্মাবস্থা থাকিত না।

মৃত্যুর পর গাত্রোত্থান।

যে পৃথিবীতে কোন সময় তোমার অস্তিত্বের কোন নাম গন্ধ ছিল না, সে স্থলে যিনি তোমাকে বিকাশ করিয়া জীবন দান করিয়াছেন এবং পুনরায় জীবন হরণ করিবেন, তাঁহার পক্ষে পরলোকে তোমাকে পুনঃ জীবন দান করিয়া দেহ ধারণ করান আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ যে কুম্ভকার বারৈক গড়িতে পারে এবং ভাঙ্গিতে পারে, সে কেন পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে অসক্ত হইবে? মনে করুন, নিদ্রিত ব্যক্তি আর মৃত ব্যক্তি একই সমান। সেই নিদ্রা হইতে যখন গাত্রোত্থান করিতে পারে, তখন মৃত্যুর পর কি জীবন ধারণ করিতে পারে না?

পথ প্রদর্শকের আবশ্যকতা।

পৃথিবীতে যত কার্য্য আছে, সকল কার্য্যেই জনৈক শিক্ষকের প্রয়োজন। বিনা শিক্ষকে কেহ কোন বিষয় শিক্ষা করিতে পারে না। মনে করুন, আপনাকে কনষ্টাণ্টিনোপল নগরে যাইতে হইবে, কিন্তু আপনি ঐ নগরের রাস্তা আদৌ জানেন না; সুতরাং জনৈক পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন। অতএব ঈশ্বর ধর্ম্মপথ দেখাইবার অভিপ্রায়ে পথ প্রদর্শক বা রছুলগণকে অবনী মণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন। পথপ্রদর্শক ব্যতীত চলিলে গন্তব্য স্থানে পঁহুছিবার আশা অতি অল্প; বরং হিংস্র শ্বাপদ কর্ত্তৃক প্রাণ নষ্ট বা কোনও ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে দিশাহারা অবস্থায় জীবনান্ত হওয়ার আশঙ্কাই অধিক।

পর পর ৪ খানি পবিত্র গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার আবশ্যকতা।

প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে আদিম মূল ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় নাই, বরং তাহার সংস্কার হইয়া আসিতেছে মাত্র। দৃষ্টান্ত স্থলে যেরূপ দেশ কাল পাত্রানুসারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আইন কানুন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, সেই রূপ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম নিয়ম সমূহের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মনে করুন এক জন মুন্সেফ বর্ষা কালে পিয়নের নৌকা ভাড়া লওয়ার আদেশ দিলেন; কিন্তু শীত কালে কি সেই আদেশ বলবৎ থাকিবে? বরং তাহা রহিত হইবে।

২য় প্রমাণ এই যে, ১৮৯৭ সালে ডাকাইত এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত, গবর্ণমেণ্ট আত্মরক্ষার জন্য অসি এবং বন্দুক ধারনের আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৯৮ সালে সেই ভয় তিরোহিত হইল। তখন কি গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের হুকুম বলবৎ রাখিবেন? কখনই না; অবশ্য সেই আদেশ রহিত হইবে।

৩য়। রোগ থাকা কালে চিকিৎসক রোগীর প্রতি যে পথ্য ব্যবহারের উপদেশ দিবেন, সেই রোগী আরোগ্য হইলে কি পূর্ব্ব পথ্য বলবৎ রাখিবেন? কখনই না।

৪। শিক্ষক বালককে স্কুলে প্রবিষ্ট হওয়া কালে যে বহি পড়িতে আদেশ দিবেন, সেই বালক যখন ক্রমশঃ কলেজে পাঠারম্ভ করিবে, তখন প্রফেসার তাহাকে কি সেই বহি পড়াইবেন? না, অবশ্য প্রথম শিক্ষার বহি পরিবর্ত্তিত হইবে।

পৃথিবীর ধ্বংস (কেয়ামত বা মহা প্রলয়।)

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, পৃথিবীর কার্য্য যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে, এই ভাবে চিরকাল থাকিবে; তাহার ধ্বংস হইবে না। নিত্য পরিদর্শন এবং অভিজ্ঞতাই সমুদয় বিজ্ঞানের বীজ। আমরা ইতস্ততঃ দেখিতে পাই— মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ প্রস্তর প্রভৃতি ঈশ্বরের সমুদয় সৃজিত বস্তু ধ্বংস হইতেছে ও হইবে। তবে কোন বস্তু অধিক দিন, কোন বস্তু অল্প দিন স্থায়ী থাকে এই মাত্র পার্থক্য। মনে করুন, এক শত বৎসর পূর্ব্বে আপনার পিতামহ যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, আপনার সময়ে সে বৃক্ষ মরিয়া যাইতেছে। ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে আপনার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃ ভগ্নাবস্থায় পরিণত হইয়া একে একে ইটগুলি খসিয়া পড়িতেছে। এমন কি, কিছুদিন পরে তাহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। মনে করুন, ২৫ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর যে গতি ছিল, অর্থাৎ যে সময় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অনুভূত হইত এবং ভূমির যেরূপ উর্ব্বরতা শক্তি ছিল, আজি কালি তাহার অনেক ইতর বিশেষ হইতেছে। মনুষ্যের

মরণ কালে স্বাভাবিক নিয়ম যে প্রকারে পরিবর্ত্তন হয়, অন্য সময়ে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। অতএব পৃথিবীর ধ্বংস কাল নিকটবর্ত্তী বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ সকল ধর্ম্মাবলম্বীরাই পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কথা স্বীকার করেন।

স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব।

ঈশ্বর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানব জাতির সহিত কোন কার্য্য করিতে পারেন না; তজ্জন্য মধ্যবর্ত্তীর আবশ্যক *। এই মধ্যবর্ত্তী বা দূতেরাই মালায়েক (ফেরেশ্‌তা) নামে অভিহিত। স্বর্গীয় দূতশ্রেণী আহার নিদ্রা এবং ইন্দ্রিয়াভিলাষী নহেন। অদৃশ্য ভাবে নিষ্পাপাবস্থায় ঈশ্বরের কার্য্যে নিয়ত নিয়োজিত রহিয়াছেন। যদি তাঁহারা দৃশ্যমান হইতেন, তবে মহা অসুবিধা হইত। যদি কেহ বলেন স্বর্গীয় দূত না হইলে কি ঈশ্বরের কার্য্য চলিত না? তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে, পৃথিবী চন্দ্র, সূর্য্য, মনুষ্য আদি না হইলে কি ঈশ্বরের কোন কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা ঘটিত?

শয়তানের অস্তিত্ব।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে শয়তান বলিয়া কোন একটী অদৃশ্য মনুষ্য-রিপু নাই। মানব জাতির পুণ্য কার্য্যে বাধা দিবার জন্য ঈশ্বর পরীক্ষা স্বরূপ শয়তানের সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি পৃথিবীতে শয়তান না থাকিত, তবে পৃথিবীতে পাপের নাম গন্ধ থাকিত না। এবং সদসৎ কার্য্যের পরীক্ষার সুযোগ হইত না। পাপের প্রলোভনই শয়তানের কার্য্য। যদি বল যাহা চক্ষুর অগোচর তাহার স্থায়ীত্ব নাই। বায়ু অদৃশ্য বস্তু, তাহার আকার এবং স্থিতি নাই; যদি বল বায়ু আছে, তবে শয়তানও আছে বলিলে ক্ষতি কি? এমন অনেক পাপ আছে, যাহা মনুষ্যের জ্ঞান থাকা সত্বেও করে এবং পাছে তজ্জন্য অনুতাপ করে, বুঝিয়াও বুঝে না। অতএব তাহাতেই শয়তানের

---

* পৃথিবীর সম্রাট্ মধ্যবর্ত্তী ব্যতীত প্রজার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কার্য্য করেন না। মন্ত্রী এবং সেক্রেটরীর যোগে কার্য্য চলিয়া থাকে।

গুপ্ত অস্তিত্ব ও গুপ্ত প্রলোভন বেশ অনুভূত হয়। অদৃশ্য শরীরী জীব অবশ্য আছে, ভৌতিক ঘটনা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ব্রাহ্ম ৺ বাবু রাজনারায়ণ বসুর দেওঘরস্থ বাসগৃহেও একদা ভূতের উৎপাত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ হাসান খাঁ জিন্নি, জিনের সাহায্যে অনেক অলৌকিক ঘটনা লোককে দেখাইয়া গিয়াছেন, একথা কলিকাতাবাসিগণ আজিও বিস্মৃত হন নাই। বিলাতী বড় বড় সংবাদপত্রে অনেক আশ্চর্য্য ভৌতিক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখা যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আরাধনার আবশ্যকতা।

ঈশ্বরের এই জগৎ সৃষ্টির আবশ্যকতা কি? যিনি একাধিকারে এক-মাত্র কর্ত্তা, যাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই, তিনি যে কেবল * আধিপত্য করিয়া শ্লাঘনীয় হওনোদ্দেশ্যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কখনও যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। মানাপমান ও প্রাধান্য শ্লাঘা নিন্দা সকলই অন্যের মুখে নিজের তৈয়ারি জিনিসের উপর প্রাধান্য করিতেছে বলিয়া কেহই সুখ শ্লাঘা বোধ করেন না। অন্যে তাহাকে প্রাধান্য করিতে দেখে, এই জন্য মনে সুখ ও শ্লাঘার উদয় হয়। আমি যদি নিজে কোন তৈয়ারি জিনিস আবিষ্কার করি, তবে তাহা আবিষ্কার করিয়াছি এইমাত্র কারণে সুখী ও শ্লাঘনীয় হই না। অপরে আমার আবিষ্কৃত বস্তুর প্রশংসা করিল, এই মাত্র কারণেই আপনাকে শ্লাঘনীয় বলিয়া সুখী হই। অতএব ঈশ্বর যে আধিপত্য করণোদ্দেশে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। তবে কি ঈশ্বরের প্রাধান্য করিবার ইচ্ছা নাই? আমরা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিব, ইহা কি তিনি অভিপ্রায় করেন নাই? তিনি যখন প্রধান, তখন প্রাধান্য

* প্রার্থনা বিরোধিগণ বলেন, ঈশ্বরের সকল কার্য্য নিয়মাধীন, অনুরোধ উপরোধ প্রভৃতি দ্বারা যখন কোন প্রতীকারের এক চুলও ব্যাঘাত হইবে না, তখন প্রার্থনায় ফল কি? বিশ্বের সকল কার্য্যের যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এক প্রকার কার্য্য বিভিন্ন উপায়ে সাধিত হইতে পারে এবং একবিধ নিয়মের দ্বারা অপরাপর নিয়মের প্রতিরোধ হইতে পারে, তাহা কি সকলে দেখে নাই? বাষ্পের বলে কোন বস্তু চালাইতে পারা যায়, এবং হস্ত দ্বারা ঠেলিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়াও চালান যায়। অগ্নি সংযোগে যে জ্বালা উৎপন্ন করা যায়, পদার্থান্তর সংযোগে তাহা নিবারণ করা যায়, এরূপ দৃষ্টান্ত রাশি রাশি মিলে। এখন প্রশ্ন করি, অধোগতির নিয়মাধীন হইয়া আধ্যাত্মিক অবনতি হইয়াছে, প্রার্থনা রূপ নিয়ম দ্বারা যে সেই অনিষ্ট ফল নিবারিত হয় না, তাহা কে বলিতে পারে? (প্রার্থনার আবশ্যকতা পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।)

করিতে অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা আছে। আমরা তাঁহাকে প্রধান বলিয়া মনে করিলে, তিনি তাহাতে শ্লাঘনীয় হন না। যেহেতু তাঁহার শ্লাঘা দেখাইবার যোগ্য সম শ্রেণীর অন্য কেহই নাই। তবে কি না আমরা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিলাম বলিয়া সন্তোষ বোধ করেন—যাহা আপনার মনে সন্তোষ দেখাইবার জন্য অন্য কাহারও আবশ্যক করে না। অতএব পাঠক মহাশয় এক্ষণে বিবেচনা করুন, আমরা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিব, ইহা দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, এইমাত্র কারণে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যদি তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন না করি, তবে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ কি? শাস্ত্রকারেরা এই দ্বিবিধ কার্য্যকে পাপ এবং পুণ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঈশ্বরের অভিপ্রেত ক্রিয়া করার নাম পুণ্য এবং অনভিপ্রেত ক্রিয়া করার নাম পাপ। এই পুণ্য ক্রিয়াকেই স্থানান্তরে উপাসনা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। ঈশ্বরের উপাসনা বা অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন না করিলে, আমরা তাঁহার কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইব।

বৈজ্ঞানিক মতে আরাধনার উপকারিতা।

আরাধনার কার্য্য ও আকার প্রকার ও ভাব ভঙ্গিতে যে শারীরিক অশেষ উপকার হয়, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ অজুর উপকারিতা—হস্ত পদ মুখ নাসিকা দন্ত প্রত্যহ ৫ বার ধৌত করিলে এবং মুছে করিলে (মুছিয়া ফেলিলে) বায়ু পিত্ত কফ প্রশমিত হয়। ২। বাহ্যিক অঙ্গ পরিষ্কার হয়। ৩। আলস্য দূর হয়। ৪। বল বৃদ্ধি হয়। ৫। দৃষ্টি শক্তি প্রসন্ন হয়। ৬। দাঁতন করিলে দন্ত পরিষ্কার হয়। মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং কফের লাঘব হয়।

অতঃপর নমাজের উপকারিতা দেখুন।

বারম্বার দণ্ডায়মান হওয়া, নত হওয়া, বসা প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ ক্রিয়াতে অঙ্গচালনা হয়, এমন কি ব্যায়ামের কার্য্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু হিন্দু দিগের আরাধনায় কখনও ব্যায়ামের কার্য্য সম্পাদিত হয় না। বরং জানু পাতিয়া

দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতে ও জলে থাকিতে থাকিতে শরীরের জড়তা বৃদ্ধি হইয়া বাতব্যাধি পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মুসলমানদিগের নামাজে যে কেবল ধর্ম্ম কাজ সম্পাদিত হয় তাহা নহে। বরং শারীরিক বল বৃদ্ধি হইতে থাকে। ফলতঃ সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে প্রত্যেক কার্য্যই কৌশলময় এবং হিতজনক।

মুসলমানদিগের জমাতে (একত্র হইয়া) নমাজ পড়ার এক সাধারণ উদ্দেশ্য পরস্পরে মধ্যে প্রীতি, ভালবাসা, একতা ও ভ্রাতৃভাব স্থাপিত ও দৃঢ়ীভূত হওয়া। প্রতিনিয়ত সাক্ষাতে পরস্পরের মধ্যে যে একতা ও ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হয়, অন্য কোনও উপায়েই তাহা হইতে পারে না। বহুকাল পর্য্যন্ত দেখা সাক্ষাতের অভাবে আত্মীয় জনও পর হইয়া যান, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। সুতরাং মুসলমানদিগের নমাজের মধ্যে যে এক বৈজ্ঞানিক কৌশল নিহিত রহিয়াছে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

পঞ্চ নামাজের পঞ্চ নির্দ্ধারিত সময়।

ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, যে সকল কার্য্যে সময়ের কোন নিদ্দিষ্টতা নাই, সেই সকল কার্য্য কখনও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। যদি আরাধনার কার্য্যে সময়ের নিদ্দিষ্টতা না থাকিত, তবে কখনই ঐ কার্য্যগুলি নির্ব্বাহিত হইত না, বরং করিব করিব বলিয়া চিরকাল অসম্পন্ন থাকিত। ২। উপাসনার সময়ে কার্য্যের প্রাপ্তি ও মানসিক বৃত্তির উন্নতি হয়। মনে করুন, আপনার ২ জন চাকর আছে। একজন নির্দ্দিষ্ট মতে আপনার কার্য্য সম্পন্ন করে, অপর জন করিব করিব বলিয়া কার্য্য মুলতবি রাখে, কি অসময়ে কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এ অবস্থায় আপনি প্রথমোক্ত চাকরের প্রতি সন্তুষ্ট এবং শেষোক্ত কার্য্যকারকের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। এইরূপ ঈশ্বর যথাসময় নমাজ আদায়কারীর প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। তজ্জন্য মুসলমান ধর্ম্মে সময়ের বাঁধাবাঁধি হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিলে শরীর সবল, রক্ত পরিষ্কার, মন প্রফুল্ল এবং শরীরের জড়তা ও গ্লানি বিদূরিত হয়। এতদ্ব্যতীত সকল কার্য্যে প্রচুর সময় পাওয়া যায়। বাহুল্য বিধায় অন্যান্য সময়ের উপকারিতা লিখা হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুদের অপকারিতা।

মুসলমান ধর্ম্মে সুরা পান এবং সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুরা পান যে সর্ব্ব বিধ পাপের একমাত্র আকর এবং আর্থিক অনিষ্টের মূল, সর্ব্বোপরি বুদ্ধি বিনাশের প্রধানতম উপায়, তদ্বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করা নিরর্থক। এখন সুদ গ্রহণের অনিষ্টতা সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে। সুদ গ্রহিতার অন্তঃকরণ অতি ক্ষুদ্র অথচ নীচাশয়তায় পরিপূর্ণ। পর-হিতৈষিতার ইচ্ছা তাহার আদৌ থাকে না। তাহা হইলে স্বার্থ রক্ষায় বাধা পড়ে। বিশেষতঃ পরকীয় সম্পত্তি কিরূপে ধ্বংস হইয়া তাহার হস্তগত হইবে, এই চিন্তা সর্ব্বক্ষণ তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকে। পরলোক গত সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ প্রফেসর মোক্ষমূলর নাইন্‌টিনথ্ সেঞ্চুরী নামক স্বনাম খ্যাত পত্রিকায় লিখিয়াছেন, কুপ্রবৃত্তির দমন এবং সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধে মুসলমান ধর্ম্মে বিশেষ নিবারক বিধান রহি-য়াছে। তিনি এতৎ সম্বন্ধে ইস্‌লাম ধর্ম্মের যার পর নাই প্রশংসা করিয়াছেন। আর ও বলিয়াছেন যে, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। বলিতে কি, উভয় ধর্ম্মকে এক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। মুসলমান ধর্ম্মে বাণিজ্য করার বিধান রহিয়াছে। বাণিজ্যের দ্বারা বণিকের যে কেবল ধন ভাগ বৃদ্ধি হয় এমত নহে, দেশের ও প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়। শিল্পকার্য্য করারও বিধান আছে। চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করাই উৎকৃষ্ট কার্য্য। ফলতঃ বাণিজ্য এবং চাকুরী দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠতম। এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে বিনা স্বার্থে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য টাকা ধার দিলে অসীম পুণ্যাধিকারী হয়। অপব্যয় করাকে কোরাণ শরিফে শয়তানের কার্য্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যুত আব-শ্যকীয় ও পরিমিত রূপ ব্যয় করার জন্য যথোচিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যাহারা এই আদেশ লঙ্ঘন করে, তাহারা সহসা দরিদ্র হইয়া পড়ে। ঈশ্বর সকল পাপ মোচন করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন; কিন্তু পরকীয় দাবি

কখনই ক্ষমা করিবেন না। আর সুদ গ্রহণ করা ও সুদ দেওয়া এক সমান পাপ *। পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করার জন্য শাস্ত্রে প্রচুর উপদেশ রহিয়াছে। কৃপণতা মহা পাপ। কৃপণতা দ্বারা দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হয়। আলস্যকে যৎপরোনাস্তি দোষের কার্য্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এক মুহূর্ত্ত সময়কেও বৃথা ব্যয় করার জন্য প্রচুর রূপে দোষারোপ করা হইয়াছে। বিনা কারণে (অক্ষম না হইলে) ভিক্ষা করাকে মহাপাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ে সুবিচার করার জন্য বহুল উপদেশ রহিয়াছে। ফলতঃ মুসলমানগণ যদি কোরাণের উপদেশ মতে কার্য্য করিত, তবে কখনই তাহাদের ঈদৃশ দুরবস্থা ঘটিত না। ঋণ গ্রহণ করিয়া পুণ্য করাকে পাপের কার্য্য বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

খৎনা বা ত্বক্‌চ্ছেদ প্রথার যৌক্তিকতা।

ত্বক্‌চ্ছেদ বিশেষ উপকারক প্রথা। ১ম, লিঙ্গাগ্র চর্ম্ম দ্বারা বেষ্টিত থাকায় তদভ্যন্তরে এক প্রকার শ্বেত বর্ণ মলিন পদার্থ জন্মিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ চর্ম্মাভ্যন্তরে প্রস্রাব আটকিয়া থাকে, তাহাতে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। তৃতীয়তঃ সঙ্গম কার্য্যে চর্ম্ম বেষ্টিত লিঙ্গাগ্রে যারপর নাই কষ্টানুভব হইয়া থাকে। অতএব এবম্বিধ অসুবিধা নিবারণ মানসে মুসলমান ধর্ম্মে খৎনার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহাদের মধ্যে খতনার বিধি প্রচলিত নাই, তাহারা তাদৃশ কষ্টানুভব করেন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ শারীরিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য ইহা অতীব প্রয়োজনীয়।

বিবাহ।

মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচলনের প্রারম্ভে আরবে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা সীমাবদ্ধ করার জন্য ৪টী বিবাহের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মে প্রথম এক বিবাহের কথা লিখিত আছে। যদি এক বিবাহে সন্তান উৎপাদন না হয়, তবে ২য় বিবাহ করিবে; যদি ২য় বিবাহে সন্তান উৎপন্ন

* সুদ দিলে নিজের সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং গ্রহণ করিলে অন্য মুসলমানের ক্ষতি হয়। এ কারণ উভয়কেই অনিষ্ট জনক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

না হয়, তবে তৃতীয় বিবাহ করিবে। যদি তৃতীয় বিবাহেও সন্তান উৎপন্ন না হয়, তবে চতুর্থ বিবাহ করিবে। একত্রে ৪ বিবাহের অতিরিক্ত করার বিধান নাই। চতুর্থ বিবাহে সন্তান উৎপাদন না হইলে, বুঝিবে অদৃষ্টে সন্তান নাই। স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত অপর স্ত্রী বিবাহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর দর্শন সিদ্ধ আছে। সঙ্গম কার্য্যের মূল্য স্বরূপ পুরুষ স্ত্রীকে মোহরানা নামক দেনা দিতে বাধ্য। মুসলমান ধর্ম্মে স্ত্রী শিক্ষার বিধান আছে। স্ত্রী সুশিক্ষিতা না হইলে ঐহিক পারত্রিক কার্য্যের উন্নতি হয় না। অশিক্ষিতা স্ত্রী আর বনের পাখী একই সমান। ফলতঃ স্ত্রী পুরুষ শিক্ষিত হইলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা স্বর্গ সুখ তুল্য ব্যাপার। স্ত্রীকে ধর্ম্ম শিক্ষা না দিলে স্বামিকে পরলোকে তাহার দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আর স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে পুরুষের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকিতে হইবে।

তালাক (বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ)।

স্বভাবের অনৈক্য কি দম্পতি সঙ্গমাসক্ত হইলে, হিন্দু ধর্ম্মে পরস্পরের বিচ্ছেদের বিধান নাই। সুতরাং তাহারা পরস্পর পরম দুঃখে কালযাপন করিতে বাধ্য। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে তজ্জন্য * বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান

---

* যে ধর্ম্মে তালাকের বিধান নাই, বলা বাহুল্য যে, উক্ত ধর্ম্ম নৈসর্গিক নিয়মের প্রতিকূল। যেহেতু ঐশ্বরিক স্বভাবের উদ্দেশ্য এই যে, জগতে মানব জাতির বংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। স্ত্রী বর্জ্জন বিধান না থাকিলে, বংশ বৃদ্ধি সম্বন্ধে সমূহ বাধা উপস্থিত হইবে। যেহেতু অনেক স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এক জনের দোষে সন্তান উৎপন্ন হয় না। পুরুষ যদি পুরুষত্ব বিহীন হয়, অথবা স্ত্রী পুরুষে সন্তান উৎপাদিকা যন্ত্রের সমন্বয় না থাকে, তাহা হইলে সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে সমূহ অন্তরায় উপস্থিত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা সহজে অনুভব করিতে পারেন। এমতাবস্থায় যদি স্ত্রী বর্জ্জনের বিধান প্রচলিত না থাকে, তাহা হইলে অনেক স্ত্রী পুরুষকে সন্তান-রত্ন লাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়। স্ত্রীর মধ্যে যদি সন্তান জন্মাইবার উপাদান থাকে, আর পুরুষের দোষে তাহা না হয়, তাহা হইলে চিরকাল তাহাদের উভয়কে এক মহাকষ্টে কালযাপন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া ঈশ্বরাভিপ্রায়ের (বংশ বৃদ্ধির) নিয়ম ভঙ্গ করা হয়। আর যদি পুরুষের মধ্যে উপযুক্ততা

থাকায় কতদূর সুবিধা হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ফলতঃ দম্পতি পরম সুখে জীবন যাপন করিলে সংসারে এক প্রকার স্বর্গীয় সুখ অনুভূত হইয়া থাকে।

দায়ভাগ।

মুসলমান ধর্ম্মের দায়ভাগ কাহাকেও বঞ্চিত করে না। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মে পুত্র বর্ত্তমানে অপর সমুদয় উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত হইতে হয়। মুসলমান ধর্ম্মে পুত্রের অর্দ্ধাংশ কন্যা এবং স্ত্রী অষ্টমাংশ পাইবে। পুত্রের অর্দ্ধাংশ কন্যা পাওয়ার কারণ এই যে, কন্যা বিবাহিতা হইয়া স্বামীর বাড়ী চলিয়া যায় এবং স্বামীর দ্বারা প্রতিপালিতা হয় এবং স্বামী বিলোপে জীবিকা নির্ব্বাহের কষ্ট হইবে, এই উদ্দেশ্যে বোধ হয় কন্যাকে পুত্রের অর্দ্ধাংশ দেওয়া হইয়াছে। আর স্বামী স্বত্বে স্ত্রীর অষ্টমাংশ পাওয়ায় উদ্দেশ্য এই যে, স্বামী পরলোক গমন করিলে স্ত্রীর ভরণ পোষণের কষ্ট হইবে, এই উদ্দেশে স্ত্রীকে অষ্টমাংশ দেওয়া হইয়াছে।

বিধবা বিবাহ।

হিন্দু ধর্ম্মে বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায়, তাহাদের মধ্যে পাপস্রোত কতদূর প্রবাহিত হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। ১। বংশ বৃদ্ধির ন্যূনতা, ২। ভ্রূণ হত্যার প্রশ্রয়। ৩। রমনীকুলের আন্তরিক কষ্টানুভব। ৪। জীবিকা নির্ব্বাহের অন্তরায়। পরমেশ্বর বিধবা বিবাহের বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়া, কতদূর সুবিধা করিয়া দিয়াছেন ও পাপের পথ বন্ধ করিয়াছেন এবং বংশ বৃদ্ধির উপায় করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আজীবন তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেও সে উপকারের একাংশ পরিশোধ হয় না। ফলতঃ স্ত্রী বিয়োগে পুরুষ অপর নারীর পাণিগ্রহণ করিতে

বিদ্যমান থাকে, এবং স্ত্রীর সন্তান উৎপাদক যন্ত্রের সঙ্গে পুরুষের যন্ত্রের সমানুপাত না থাকায় সন্তান জন্মিতেছে না, ইহাতে প্রকৃতির উদ্দেশ্য লঙ্ঘন করা হয়। স্ত্রী বর্জ্জনের বিধান থাকিলে এই সকল বিষয়ে কোন আপত্তি ও অসুবিধা থাকে না।

পারিবে, পক্ষান্তরে স্বামী বিয়োগে স্ত্রী অপর স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে না, ইহা কি কখনও যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? এরূপ করা সম্পূর্ণ অবিচার সন্দেহ নাই। হিন্দু ধর্ম্মে স্বামী বিয়োগে স্ত্রী সহমরণ বিধানের বাধ্য হইবে, ইহা কতদূর সহৃদয়তার কার্য্য একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

কবর দেওয়া।

মৃত ব্যক্তিকে হিন্দুরা দাহ করে এবং অগ্নি সংযোগে উহা স্ফীত হইয়া উঠিলে বংশখণ্ড দ্বারা খোঁচা মারিয়া মস্তক চুর্ণ বিচূর্ণ করে। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়, সে প্রথমেই মুখে অগ্নি দেয়। এ সকল কার্য্য যে নিতান্ত নৃশংস জনক ও বীভৎস, তাহা কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন? এরূপ নৃশংস ব্যাপার দর্শনে লোকের মন নিতান্ত কঠোর হইয়া উঠে। দগ্ধীভূত মনুষ্যের দুর্গন্ধময় ধূমপুঞ্জ জীবিত ব্যক্তির নাসিকা রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে, স্বাস্থ্য হানি হইয়া থাকে। মুসলমান ধর্ম্মে ঈদৃশ নৃশংস ব্যবহারের বিধান নাই। মুসলমানের মৃতদেহ ৩—৩৷৷০ হাত মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিয়া রাখে। হিন্দু ধর্ম্মে এক জাতীয় লোক অন্য জাতিকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শূদ্রকে, এমন কি কুল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকে দাহ করিলে জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। কিন্তু মুসলমান জাতি স্ব ধর্ম্মাবলম্বী নিম্ন শ্রেণীস্থ স্ব জাতীয় লোককেও গোর দিতে শাস্ত্রানুসারে বাধ্য। না দিলে মহাপাতকী হইতে হয়।

অবরোধ-প্রথা।

মুসলমান দিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত থাকায়, সামাজিক বিষয়ে কতদূর মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু মুসলমানদের মত এত আঁটাআঁটি নাই। যে টুকু আছে, তাহাও মুসলমানদিগের সংস্রবে হইয়াছে। অতি ঘনিষ্ট আত্মীয় ব্যতীত অপর আত্মীয়েরা যুবতী স্ত্রীকে দেখিতে পারে না। অবরোধ-প্রথা দ্বারা যে কেবল কুলকামিনীদিগের সতীত্ব রত্ন রক্ষিত হইতেছে, তাহা নহে—ব্যভিচারের পথ বন্ধ হইয়াছে এবং লজ্জাশীলতা অক্ষত

রহিতেছে। কুকর্ম্ম নিবারণের ৭টী অন্তরায়। ১। ধর্ম্মভয়। ২। প্রলুব্ধ বিষয়ের অভাব। ৩। গুরু জনের ভয়। ৪। লজ্জাশীলতা। ৫। প্রলুব্ধ বিষয় পাওয়া স্বত্বেও মনঃপূত না হওয়া। ৬। স্থানের অভাব। ৭। রাজদণ্ড ভয়। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ যে অভিপ্সিত বিষয়ের অভাব প্রযুক্ত অধিকাংশ সময় পাপ হইতে বিমুক্ত রহিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নারী জাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতি অধিকাংশ সময় কুকর্ম্মে লিপ্ত হয়। তাহার কারণ, পুরুষ জাতি অবরোধ প্রথার বশবর্ত্তী নহে; কাজেই লোভনীয় বস্তু হস্তগত হইতে বাধা জন্মে না। নারী জাতি যত লজ্জাশীলা, পুরুষ জাতি তত নহে। আবার নগরবাসী পুরুষ ও নারী অপেক্ষা গ্রাম্য পুরুষ ও নারী অধিক লজ্জাশীল এবং লজ্জাশীলা, তাহার কারণ বহু দর্শনাভাব। অতএব বহু দর্শন এবম্বিধ পাপের চাবি স্বরূপ। জগদীশ্বর অবরোধ প্রথার সৃষ্টি করিয়া, যে অন্তঃপুর বাসিনী রমণীকুলের পাপের পথ বন্ধ করিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ফলতঃ যদি অবরোধ-প্রথা প্রচলিত না থাকিত, তবে নারীগণ স্ব স্ব সহধর্ম্মীর প্রতি কখনও সন্তুষ্ট থাকিত না। বরং সর্ব্বদা ব্যভিচারে লিপ্ত হইত। স্বেচ্ছাচারিণী পাশ্চাত্য নারীগণের কার্য্য কলাপ পর্য্যালোচনা করিলে, এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি হইতে পারে। *

* এই সকল ব্যতিত স্ত্রীলোকদিগকে অবরোধাবস্থায় না রাখিয়া স্বাধীনতা প্রদান করিলে, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। যেহেতু অর্থোপার্জ্জন এবং জীবিকা নির্ব্বাহের ভার স্বভাবতঃ পুরুষের প্রতি সমর্পিত। তাহারা কষ্ট-সহিষ্ণু, দৃঢ়কায় ও প্রবাস যাতনা সহ্য করিবার উপযুক্ত। সুতরাং তাহাদের প্রতি বহির্জ্জগতের কার্য্যভার সমর্পিত। নারী স্বভাবতঃ ভীরু, দুর্ব্বল, চঞ্চলা। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে মাসে মাসে ঋতু-পদ্ধতি প্রতিপালন ও গর্ভ ধারণ করিতে হয়। গর্ভপাত অন্তে মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত অনবরত রক্তস্রাবের কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সুতরাং তাহারা স্বভাবতঃ বহির্জ্জগতের ব্যবসা বাণিজ্য ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়াবলম্বনের উপযুক্তা নহে। বরং গৃহজগতের কার্য্য নির্ব্বাহ, সন্তান সন্ততিদিগের লালন পালন ও আহারীয় সামগ্রীর আয়োজন করাই তাহাদের প্রকৃতিগত কর্ত্তব্য কার্য্য। অতএব স্ত্রীলোকদিগকে বহির্জ্জগতের কার্য্যে রাখিয়া অবরোধ-প্রথার অবমাননা করা স্বভাব ধর্ম্মের মস্তকে কুঠারাঘাত করা মাত্র।

প্রতিবাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার।

মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রতিবাসী মুসলমানদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। প্রতিবাসী পীড়িত হইলে তাহাকে দেখিতে হইবে। আহারীয় ও পরিধেয় না থাকিলে তাহাকে তাহা যোগাইতে হইবে। দরিদ্র হইলে যথোচিত সাহায্য করিতে হইবে, মরিলে পর গোর কাফনের বন্দো-বস্ত করিতে হইবে এবং তাহার জন্ম ঈশ্বরের সমীপে পারলৌকিক মঙ্গলের প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রতিবাসীর প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবে না। প্রতিবাসী ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহার সুখ দুঃখের সঙ্গী হইতে হইবে। ফলতঃ সমাজ বন্ধনের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম যে কিরূপ মঙ্গলকর ও সুবিধা জনক, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

জাকাৎ (বিশেষ দান)।

মুসলমান ধনীর ধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দীন দরিদ্র আত্মীয় এবং অনাত্মীয়দিগকে দান করিতে হইবে। আহার পোষাক গৃহ নির্ম্মাণ চিকিৎসা প্রভৃতি আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে বৎসরান্তে যাহার নিকট ৫২৲ টাকা সঞ্চিত থাকিবে, ধর্ম্মমতে তাহাকে ধনী বলিয়া স্বীকার করা হইবে। আগে নির্ধন কুটুম্ব পরে দরিদ্র অনাত্মীয়দিগকে দিতে হইবে। দূরস্থ অপেক্ষা নিকটবর্ত্তীর দাওয়া অগ্রগণ্য। বস্তুতঃ দরিদ্র প্রতিপালনের উদ্দেশে দয়াময় সর্ব্বনিয়ন্তা মুসলমান ধর্ম্মে এইরূপ শাস্ত্রগত বিধান প্রচলিত করিয়া যে কতদূর সুবিধা করিয়াছেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মকর্ত্তার চরিত্র।

খ্রীষ্টানদিগের পোপ ও অন্যান্য পাদরি, হিন্দুদিগের গুরু, পুরোহিত, সাধু সন্ন্যাসী এবং বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগুরু মাত্রেই স্বকীয় প্রাধান্য ও স্বার্থ, ইন্দ্রিয়াভিলাষিতা এবং অহঙ্কারের আভাস দিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম-কর্ত্তা পয়গম্বর সাহেব, এমন কি, তদীয় প্রিয় শিষ্য মণ্ডলীর জীবনচরিত পাঠ করিলে তাহার বিন্দুমাত্র কলঙ্ক কালিমা দৃষ্ট হয় না। তাঁহার বাক্যাবলী ও কার্য্যাবলী (হদিস) গ্রন্থে তিনি যে ঈশ্বরের দাস এবং কোন কার্য্যে ঈশ্বর ব্যতীত তাহার বিন্দু বিসর্গ অধিকার নাই এবং তাঁহার কবর কি উপাসনালয়কে ধরায় মস্তক লোটাইয়া প্রণাম করিলে মহা পাতকী হইতে হইবে এবং ঈশ্বরের আরাধনা না করিলে, তাহার বংশীয়গণের কোন প্রাধান্য থাকিবে না এবং তাঁহার বংশজগণের সংস্রব না হইলে কোন শাস্ত্রিক ক্রিয়া আবদ্ধ থাকিবে না বলিয়া স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে। তিনি নম্র প্রকৃতি, সদালাপী, নিরহঙ্কারী, নিরপেক্ষ, সহৃদয়, মুক্তহস্ত, সত্যবাদী, পরহিতৈষী, আতিথেয়, নির্ব্বিবাদী, লজ্জাশীল, অকপট, নিঃস্বার্থপর, সংসার বিরাগী ও ইন্দ্রিয়াভিলাষ বিবর্জ্জিত প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন।

পৌত্তলিক হিন্দুদিগের সংস্রবে ভারতীয় মুসলমানদিগের ভয়ানক অনিষ্ট হইয়াছে।

পৌত্তলিক হিন্দু জাতি যে এ দেশের আদিম অধিবাসী, তাহার আর সংশয় নাই। হিন্দু ধর্ম্মে জাতিভেদ আছে। এক জাতির পক্কান্ন অন্য জাতীয় হিন্দুর ভক্ষণ নিষেধ, উচ্ছিষ্ট অপবিত্র, বিধবা বিবাহ দোষণীয়; মৃত দেহ অপবিত্র, কুল গৌরব, জাতীয় বিদ্বেষ বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান রহি-য়াছে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে এরূপ বিধান নাই, বরং থাকিলে সমধিক দোষণীয়। পশ্চিম রাজ্য এমন কি, মক্কা মাজ্জমায় এ সকলকে নিতান্ত

হের জ্ঞান করেন। আরব দেশে জাতিভেদ কুল গৌরব, ও জাতীয় বিদ্বেষ মাত্রও নাই। সকল মুসলমানই পরস্পর ভাই; যে শিক্ষিত ও ধর্ম্মশীল, সেই গৌরবান্বিত। স্ব ধর্ম্মাবলম্বীর উচ্ছিষ্টকে অপবিত্র মনে করে না। বরং ধর্ম্মশীল মুসলমানের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলে রোগ মুক্ত হয়, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় বলিয়া তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এক খানি বৃহৎ ভোজন পাত্রে ২০।২৫ জন একত্রে ভোজন করে। ফলতঃ বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, কুল গৌরব, জাতিভেদ এবং ব্যবসাদি জাতি বিশেষের প্রতি একচেটিয়া ন্যস্ত থাকাই, জাতীয় বিদ্বেষ ও অবনতির মূল কারণ। আদিম ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে এই দূষণীয় প্রথা প্রচলিত ছিল না বলিয়াই, তাহারা এত অল্প দিনের মধ্যে এক আরব ভূমি হইতে সুদূর স্পেন, পর্ত্তুগাল পর্য্যন্ত ইস্‌লাম-বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতে * পারিয়াছিল; অন্য দিকে ভারতবর্ষ ও চীন দেশ পর্য্যন্ত ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সমস্ত ইউরোপের খ্রীষ্টান মণ্ডলী জেরুজেলম নগর হস্তগত করার জন্য বহুবার একযোগে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। হিন্দুদিগের সংস্রবে ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে নানাপ্রকার কুপ্রথা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়াছিল ও আছে এবং হইতেছে। এমন কি কোন কোন অশিক্ষিত মুসলমান, প্রতিবাসী হিন্দুদিগের দৃষ্টান্তানুসারে মাণিকপীর, সত্যপীর, ও গাজী, ওলা দেবী, শীতলা দেবী, মনসা দেবী প্রভৃতির নজর মানস করিয়া থাকে। স্নান না করিয়া ভাত খাওয়াকে দূষণীয় জানে, হল কর্ষণ ও বিধবা বিবাহকে অপমান মনে করে। পায়ে মূত্র কি বিষ্ঠা লাগিলে (তিন বার ধৌত করার পরিবর্ত্তে), স্নান করিয়া থাকে। পার জামার পরিবর্ত্তে ধুতি পরিধান করে। মস্তকে টুপি ধারণ করিতে লজ্জিত হয়। আবার যাত্রার শুভাশুভও গণনা করিয়া থাকে। হিন্দু পর্ব্বোপলক্ষে নূতন কাপড় পরিধান করে, মাসের প্রথম দিনে কোন স্থানে গমন করে না। মাসদগ্ধ, দিক্‌শূল প্রভৃতি মানিয়া থাকে।

মুসলমান ধর্ম্মের দ্বারা জগতের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে।

---

* খোদার ফজলে এখন পৃথিবীতে এমন স্থান নাই, যেখানে মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তৃত না হইয়াছে।

মুসলমান ধর্ম্মের দ্বারা নরহত্যা, শিশুহত্যা এবং সুরা পান নিবারিত হইয়াছে। অনির্দ্দিষ্ট বহু বিবাহের প্রথা উঠিয়া গিয়াছে; চারি সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। বেশ্যা বৃত্তি এবং পরদার গমনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। পৌত্তলিক ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে, অসভ্যদিগকে সভ্য করা হইয়াছে, উলঙ্গদিগকে পরিচ্ছদ ব্যবহারের নিয়ম শিক্ষা দিয়াছে, নরমাংস এবং মৃত জীব জন্তর মাংস ও কাঁচা মাংস ভক্ষণ নিবারণ করিয়াছে। পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, অঙ্গীকার পালন, সরলতা, অপক্ষপাত, সতীত্ব রক্ষা, সচ্চরিত্রতা, ক্রীতদাসকে মুক্ত করা, বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন, উপচীকির্ষা, অনিষ্ট করিলে মার্জ্জনা করা, অন্যে মন্দ করিলে তৎপরিবর্ত্তে তাহার উপকার করা, ত্যাগ স্বীকার, পৃথিবীতে প্রশংসা পাইবার আশা না করিয়া পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ধর্ম্মপথে চলা, এই সমস্ত কার্য্য শিক্ষা দেয়। নম্রতা শিক্ষা এবং রিপু সমূহকে দমন করা, মৃত্যুর পূর্ব্বে কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করা, আরাধনা যে ধর্ম্ম কার্য্যের একমাত্র স্তম্ভ এবং স্বর্গের চাবি, পৃথিবী অসার, পরকাল সার, এই সকল অমূল্য উপদেশ দিতেছে।

তরবারি দ্বারা ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রচারের অপবাদ খণ্ডন।

বিধর্ম্মীরা বলেন, মুসলমানেরা তরবারি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে। প্রথমে নূতন মত মাত্র এক জনের মস্তিষ্কে থাকে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এক জন ইহা বিশ্বাস করে। এক জন মানুষ সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। সে যদি তরবারি ধরিয়া তাহার মত প্রচার করে, তাহার কৃতকার্য্য হইবার আশা বৃথা। ফলতঃ ঈশ্বর কৃপায় সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। বিধর্ম্মীর উক্তি মিথ্যা। জগতের সত্য ইতিহাস তাহার সাক্ষী। তরবারি দ্বারা কোন ধর্ম্ম কখনই প্রচারিত হইতে পারে না; দু দশ জন লোক ভয়ে ঐ মত অবলম্বন করিলেও, পৃথিবীর কোটি কোটি নর নারীর সেই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পয়গম্বর (স) সাহেব যখন ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের প্রারম্ভে, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ও সহায় সম্বল হীন ছিলেন; এমন কি, যখন তাঁহার আত্মীয়

কুটুম্ব ও পরিবারস্থ লোকগণ ঘোর বিরোধী এবং প্রাণনাশক শত্রু রূপে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাকে নানাবিধ বিপদ জালে আবদ্ধ ও নানা উপায়ে লাঞ্ছিত এবং অবমানিত করিতে কুণ্ঠিত ছিল না, তখন তিনি যে একাকী কিরূপে এতাধিক বীর্য্যবন্ত দুর্দ্দান্ত পরাক্রমশালী আরব সন্তানদিগকে তরবারির সাহায্যে স্বীয় মতানুবর্ত্তী করিয়াছিলেন, এ কথা কি সরল ভাবে একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত নহে ? বরং এই কথা ঐতিহাসিক জ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তিনি কেবল ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ, নির্ম্মল চরিত্র ও অলৌকিক ঘটনাবলী দেখাইয়া এবং সর্ব্বোপরি জ্বলন্ত ঈশ্বর-ভক্তির অটল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, সর্ব্বসাধারণের মনাকর্ষণ করেন। এই সকল গুণ জালে আবদ্ধ হইয়াই দলে দলে জনসাধারণ তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইতে থাকেন। আত্মরক্ষার্থে 'জেহাদ' প্রথা প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে বহুসংখ্যক লোক সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। মদিনা যাওয়ার পরেই 'জেহাদ' বিধান অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তিনি মক্কা নগরে অবস্থান কালীন অনেক তেজ বীর্য্য শালী আরব সন্তান তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান প্রচারক বন্ধু চতুষ্টয় মক্কা নগরে স্বেচ্ছায় ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের কথা জগৎ বিদিত। মহাবীর হামজা (রাজিঃ) মক্কা নগরেই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। আবুজর ও ওনাইছ এবং তাঁহার মাতা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যখন নিজ দলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের বাচনিক ইস্‌লাম ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া দলে দলে লোক মুসলমান হইতে লাগিলেন। এমন কি, হজরত মক্কা নগরে থাকিতে বিধর্ম্মিগণের অত্যাচার পরম্পরায় ৮৩ জন মুসলমান দেশত্যাগী হইয়া হাবশ (আবিসিনিয়া) রাজ্যে চলিয়া যান। তাহা ছাড়া তৎকালে অনেক লোক অমানুষিক কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করিয়াও মক্কায় ছিলেন; হাবশ-রাজ হজরতের ধর্ম্মতত্বের কথা শুনিয়াই ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মদিনায় হেজরত করার পূর্ব্বে, মক্কা নগরে এক দল মদিনাবাসী তাঁহার যুক্তিপূর্ণ ধর্ম্ম-বক্তৃতা শুনিয়া মুসলমান হন এবং তাঁহারা স্বদেশে আসিয়া একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের প্রশংসা করেন। তৎপর ক্রমশঃ আরও কয়েক দল মদিনাবাসী লোক ইস্‌লাম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে পাদরী সি, এন, সরকারের মতামত।

ইস্‌লাম আত্মার উচ্চতর অস্তিত্ব ও অবস্থা প্রাপ্তির নিয়ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য বিজ্ঞান ও হেতুবাদ সম্মত ধর্ম্মনীতি। ইস্‌লাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে তৎকৃত কার্য্য চিন্তা ও ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করে। মধ্যস্থ রূপে কোন প্রায়শ্চিত্ত উপস্থিত করিয়া পাপ-ভীতি হইতে কাহাকেও নিষ্কৃতি দেয় না। জগৎ পত্তনাবধি যে কোন ব্যক্তি দ্বারা জগতে ধর্ম্মনীতি ও ঈশ্বর তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের কোন ব্যক্তি দ্বারা কোন সময়ে ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে কোন ভ্রান্তি মূলক শিক্ষা প্রকাশিত হয় নাই। শাস্ত্রাচারী খৃষ্টিয়ান ভ্রাতৃগণ যে ত্রিত্ববাদ প্রচার করেন, ও বিশ্বাস করেন, হজরত ঈশা কদাচ তন্মত কোন শিক্ষা দেন নাই। হজরত ঈশার ৩০০ বৎসর পরে আন্তিওক নগরের বিশপ দ্বারা ত্রিত্ববাদ কল্পিত ও প্রচারিত হয় এবং তজ্জন্য তৎকালে খ্রীষ্টিয়ান জগতে যে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। প্রতিমা পূজা এবং ঈশ্বরের বহুত্ব কল্পনাই ভ্রান্ত মানব বুদ্ধির ভ্রান্তি বিজড়িত আবিষ্কার; কিন্তু ঈশ্বর নিশ্বসিত কিম্বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা কেহ কোন কালে ঈশ্বরের একত্বের বিরুদ্ধে কোন শিক্ষা দেন নাই। বরং তদ্বিপরীত প্রত্যেক জন প্রায় প্রাণান্ত পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া মহা সংগ্রাম করিয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় প্রভৃতি ঘটনা পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সংজ্ঞান বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় কি থাকিতে পারে? যাবতীয় বিজ্ঞান এবং যাবতীয় প্রকৃতি মিলিয়া এক স্বরে ঈশ্বরের একত্ব ঘোষণা করিতেছে। আমাদের শারীরিক গঠনে আমাদের প্রকৃতিতে আমাদের দৈহিক জীবনে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার একত্ববাদ প্রচার করিতেছি। হজরত আদম (আলাঃ) অবধি হজরত নোহ (আলা) পর্য্যন্ত, হজরত নোহ (আলাঃ) হইতে হজরত ইব্রাহিম (আলাঃ) পর্য্যন্ত, হজরত ইব্রাহিম (আলাঃ) হইতে হজরত মুসা (আলাঃ), দায়ুদ (আলাঃ) এবং ঈসা (আলাঃ) পর্য্যন্ত ও তদবধি বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় বিশ্বাসী ব্যক্তি দ্বারা ঈশ্বরের নির্ভাজ একত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকৃত এবং প্রচারিত

হইয়া আসিতেছে। ইস্‌লাম ধর্ম্মনীতি সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে ধ্রুব রূপে সেই মহান্ সত্যে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দেয়। হজরত মহম্মদের (দঃ) শিক্ষাতে এমন কিছুই নাই, যাহাতে মানব বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া মানব কল্পিত কোন রীতি নীতিকে পালনীয় ব্যবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি পায়। তাঁহার শিক্ষাতে এমত কিছুই নাই, যাহাতে ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে মানব মণ্ডলীর কোন ভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিতে পারে; এই সকল কারণ বশতঃই বলি, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আপনিই আপনার প্রমাণ; তিনি প্রার্থনাকে ইস্‌লাম ধর্ম্মনীতির প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। প্রার্থনার গুরুত্ব উপলব্ধি করণার্থে ও অন্যবিধ উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনার্থে প্রার্থনার পূর্ব্বে হস্ত, পদ, মুখমণ্ডল, মস্তক, গলদেশ, কর্ণমূল এবং শরীরের গুপ্তাংশ অতি পরিষ্কার রূপে প্রক্ষালনের (ওজুর) ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন।

ইস্‌লাম প্রার্থনা-পদ্ধতি মানবকে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখে। হজরত রসুল (দঃ) আমাদিগকে দিবা রাত্রির মধ্যে পাঁচ বার প্রার্থনা করিতে দৃঢ় আদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান আদেশটী শিরোধার্য্য করিয়া পালন করেন। কিন্তু ৫ পাঁচ বার নমাজ পড়িবার দৃঢ় আদেশ না থাকিয়া, "নিরন্তর প্রার্থনা করা ভাল" কিম্বা "সতত প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য" প্রার্থনা সম্বন্ধে মোহাম্মদ (দঃ) যদি এই প্রকার কতকগুলি কথা কহিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান প্রার্থনাশীল মুসলমান বর্ত্তমান খ্রীষ্টিয়ান সমাজের ন্যায় প্রার্থনা হীন হইয়া পড়িত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তোমরা নিরন্তর প্রার্থনা কর, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা-কর, এবম্বিধ অনেক আদেশ থাকিলেও খ্রীষ্টিয়ান জন সাধারণ প্রার্থনা করণ জন্য কতকগুলি বেতনভোগী প্রার্থনাকারী মিশনারী প্রিষ্ট (পুরোহিত) নিযুক্ত করিয়া, আপনারা প্রার্থনা করণের দায় হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। কেবল রবিবার দিনে একবার প্রার্থনা গৃহে মুখ দেখাইলেই তাহাদের যথেষ্ট। কিন্তু ভাই খ্রীষ্টিয়ান, তাহা নহে। প্রার্থনার আবশ্যকতা ও গুরুত্ব, এবং কেমন সর্ব্বদা আপনাকে প্রার্থনা নিরত রাখিতে হয়, পবিত্র ইস্‌লাম এই সকল বিষয় আমাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করেন এবং প্রত্যেক প্রার্থনার পূর্ব্বে নিয়মিত ওজু মানবকে প্রার্থনা সম্বন্ধে এক উচ্চ ভাবে পরিচালিত করে।

জমাতে নামাজ পড়া সম্বন্ধে পাদরি সি, এন সাহেবের মত।

*সমবেত প্রার্থনার উচ্চতর অনেক উদ্দেশ্য আছে। সে সমস্ত এই প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভাবিত নহে। আমরা বাহ্য দৃশ্যে সমবেত প্রার্থনাতে ভ্রাতৃভাব ও সাম্যের কেমন মনোমোহন সুন্দর চিত্র দেখিতে পাই। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, মুটে সওদাগর, জ্ঞানী অজ্ঞান, মূর্খ বিদ্বান, সকলে মিলিয়া একই সৃষ্টিকর্ত্তার একই উপাস্য মহান্ ঈশ্বরের সাক্ষাতে স্কন্ধে স্কন্ধ মিলাইয়া, ভক্তি সহকারে চমৎকার ভ্রাতৃভাবে যখন দাঁড়ায়, তখন কি তথায় এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় প্রভা উদ্ভাসিত হয় না? বাস্তবিক ইস্‌লাম সমবেত প্রার্থনা স্থল স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাবের চমৎকার অঙ্গণ। এই স্থলে পার্থিব সামাজিক পদমর্য্যাদা কিম্বা পদহীনতা কিছুই নাই। সৃষ্টি-কর্ত্তার সাক্ষাতে রাজা, প্রজা, ইতর, ভদ্র সকলেই সমান। উনি বড় সাহেব উঁহার পায়ে জুতা থাকিলে কোন দোষ নাই, এই খ্রীষ্টানী ভাব তথায় এখন পর্য্যন্ত প্রবেশ পথ পায় নাই এবং অনন্ত কালেও পাইবে না।

আমাদের রসুল (দঃ) আমাদিগকে যে ঠিক নিরূপিত সময়ে প্রার্থনা করিতে আদেশ দিয়াছেন, তাহারও মহৎ উদ্দেশ্য আছে। তাহাতে অভ্যাস পরিপক্ক হয় ও নমাজে যাবতীয় সাধু, বিশ্বাসী নমাজীদিগের সহযোগী হওয়া যায় এবং নিরূপিত কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী হয় নাই বলিয়া হৃদয়ের প্রফুল্লতা অক্ষুণ্ণ থাকে। মুসলমান যে অবস্থায় যে স্থানে থাকুক না কেন, নমাজের নিরূপিত সময় তাহাকে জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিতেই হইবে। ইহাতে কোনও আপত্তি নাই। ইস্‌লাম প্রার্থনা-পদ্ধতির সৌন্দর্য্য ও প্রভাব সমস্ত জগৎ সংসারে নিত্যই বিকসিত হইতেছে। চক্ষু উন্মীলন করিলেই তাহা দেখিতে পাইবে। একটী মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল।

সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাবতীয় মুসলমান পরস্পর ভ্রাতা। হজরত রসুলের (দঃ) স্বর্গীয় শিক্ষার প্রভাবে এই জগতে যেমন, পর জগতেও তেমনি তাহারা পরস্পর ভ্রাতা। এই ভ্রষ্ট ও দ্বেষ-বিদ্বেষ পরিপূর্ণ জগতী তলে মাত্র দুটি স্থানে অর্থাৎ ইস্‌লাম ধর্ম্ম মন্দিরে ও সমাধি স্থানে সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের জ্বলন্ত চিত্র দেখিতে পাই। আমাদের রসুল (দঃ) আমাদিগকে দান করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই ব্যবস্থাটী নূতন নহে। হজরত মুসা সম্পত্তির কিম্বা

উপার্জ্জনের দশমাংশ দান করিতে দৃঢ় আদেশ দিয়াছেন। হজরত ঈসা যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করতঃ তাহার পশ্চাদ্গামী হইতে আদেশ দেন। শেষ ধর্ম্ম প্রচারক মানব মণ্ডলীর দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া, আমাদের রসুল (দঃ) তাঁহার অনুগামীদিগের জন্য জাকাৎ দানের ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা সহজ সম্পাদ্য। সমাজের দীন দরিদ্র লোকদিগের উপকারার্থে, ইস্‌লাম নীতি প্রচার ও বিস্তারার্থে, ঐশ্বরিক গৃহাদি স্থাপন, সংস্কার ও সুসজ্জিতাবস্থায় রাখিবার জন্য অনাথ ইস্‌লাম বালক বালিকাদিগের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার্থে প্রভূত পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন। অতএব মুসলমান যে আমরা—আমাদের রসুলের আদেশানুযায়ী দানশীল হই, সর্ব্বস্বের দাতা মহান্ আল্লাহ্‌তাআলার নামে যেন কোন মোস্‌লেম হস্ত কার্পণ্যে সঙ্কুচিত না হয়, ইহা অতি কাঙ্খনীয়।

বাইবেল হইতে ইস্‌লামের সত্যতা প্রমাণিত।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর রেছালত অর্থাৎ পৃথিবীতে আগমন সম্বন্ধে ১৩০৬ বাং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের প্রচারক পত্রিকায় বাইবেল হইতে উদ্ধৃত করিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এ স্থানে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

আল্লা (আরব দেশীয়) পারণ পর্ব্বত হইতে আপন তেজ (অগ্নি) প্রকাশ করিলেন। দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩।২ পদ এবং যোহন ভাববাদী (ইয়াহায়া আলায়হেচ্ছালাম) বলিতেছেন—

কিন্তু যিনি [মোহাম্মদ (দঃ)] আমার পরে আগমন করিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা ক্ষমতাবান, যাঁহার পাদুকা বহন করিতেও আমি যোগ্য নহি, তিনিই তোমাদিগকে পবিত্র আত্মাতে এবং অগ্নিতে (অগ্নির ন্যায় জ্বলন্ত ধর্ম্মে) বাপ্তাইজ (দীক্ষিত) করিবেন। কুলা (জেহাদীয় করবাল) তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। তিনি আপনার খামার (মণ্ডলী) নিঃশেষে পরিষ্কার করিবেন, আপনার গোম (মোসলমান লোক) তিনি গোলায় মণ্ডলীতে) সংগ্রহ করিবেন, এবং আগরা (কাফের) সকল তিনি অনির্ব্বাপনীয় অগ্নিতে (অনন্ত নরক অগ্নিতে) দগ্ধ করিবেন। (ইঞ্জিল) মথি (বম ওয়েচ সাহেব, অনুবাদিত বাইবেল) ৩, ১১, ১২, পদ। কেহ কেহ বলেন, যোহন ভাব-

বাদী যীশুখ্রীষ্টের আসিবার কথা বলিতেছেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; কারণ যোহন ভাববাদী বলিতেছেন, "যিনি আসিবেন তিনি"। বাইবেল পাঠে জানিতে পারা যায়, তখন যীশু এসেছেন। আসিবেন এ কথা বলার সময় তখন অতীত হইয়া গিয়াছিল। আর যোহন ভাববাদীর এই ভাবোক্তির সঙ্গে যীশু-খৃষ্টের কোনই মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। যেহেতু যোহন ভাববাদী বলিয়াছেন, তিনি খামার (মণ্ডলী) পরিষ্কার করিবেন। কিন্তু যীশু মণ্ডলী পরিষ্কার করিবার স্থলে বলিয়াছেন, শামা ঘাস (মন্দ লোক) থাকিতে দাও। সুতরাং যোহন ভাববাদীর কথা, যীশুখ্রীষ্টের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত।

পক্ষান্তরে ভাববাদীর অগ্রগণ্য হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সঙ্গে প্রত্যেক কথার মিল জ্বলন্ত ভাবে রহিয়াছে। তবে বর্ত্তমান খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মে যাহারা অন্ধ বিশ্বাসী, তাহারা দেখিতে পান না।

সমাপ্ত